আনন্দমেলা

কলকাতা সংখ্যা ৩

১৯ জুন ১৯৮৩
২·৫০
আনন্দবাজার প্রকাশনা

প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক কাহিনী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সম্পূর্ণ উপন্যাস অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প

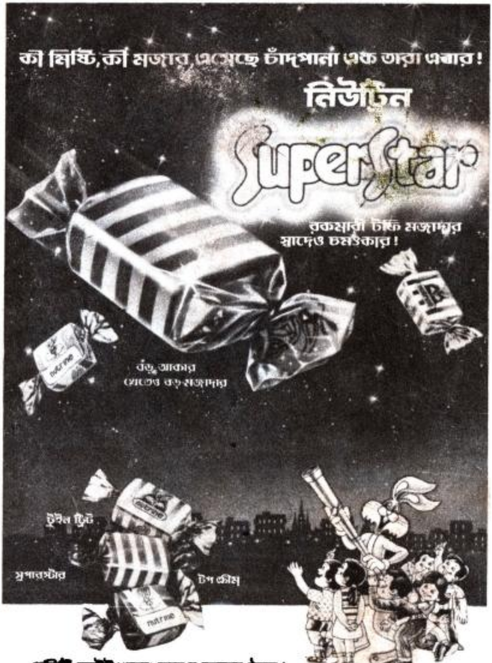

প্রতিটি সুইট খাসা; দারুণ মজায় ঠাসা!

nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সুইট

নিউট্রিন কনফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর, অ.প্র.

CLARION/NC/8339 BEN

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বলে গেছেন রাম শর্মা ৪৮
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ঐতিহাসিক কাহিনী

হেস্টিংসের বন্ধু পলিয়ের ৫
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

গল্প

রাস্তার ছেলে ১৯
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বটুবাবুর ছাতা ২৩
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ভাড়াটে খেলোয়াড় ২৯
সুতপন চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ রচনা

তোমাদের হাতেই কলকাতা ১১
পবিত্র সরকার

কলকাতার কথা ১৪
সমর বসু

প্রথম বাস ৪৫
বারিদবরণ ঘোষ

পালকি থেকে মেট্রো ৮৩
চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

ছড়া

ন্যাড়া কলকাতা ২৭
সুনীলকুমার নন্দী

এ-কলকাতা ২৮
রঞ্জন ভাদুড়ী

খেলাধুলো

মেজাজ গরম ৮৭
মণি শর্মা

ফলো-উইন ৮৯
সম্রাট রায়

সেই সঙ্গে লেখাপড়া, কমিকস, ধাঁধা শব্দসন্ধান, মজার খেলা, উত্তর বটে ও অন্যান্য আকর্ষণ।

প্রচ্ছদ : তপন দাশ
(শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি)

মেঘ ডাকে গুরুগুরু
সকালবেলা
ঝুপঝাপ হল শুরু
বর্ষার খেলা।
রোদ্দুর নেই মোটে,
স্যাঁতসেতে সবই,
জানালার কাচে ফোটে
বৃষ্টির ছবি।

১৪ আষাঢ় ১৩৯০ ২৯ জুন ১৯৮৩ ৯ বর্ষ ৬ সংখ্যা

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাণাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

দারুন ধোলাই
সবার মতে
কম খরচে
কেল্লাফতে,
Sahara SOAP
EXPORT QUALITY
তিন রকম সাইজে
পাওয়া যায়
সাহারা
কাপড় কাচার সাবান
সাদা কাপড় আরো সাদা – ধবধবে,
রঙীন কাপড় হবে ঝলমলে।
ডিস্ট্রিবিউটারশিপ্ এর জন্য
যোগাযোগ করুন
প্রধান কার্যালয় :—
সাহারা কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৩০বি, শান্তি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৩
IDEAL

হেস্টিংসের বন্ধু পলিয়ের

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

রবার্ট ক্লাইভ পলাশির যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ফলে আস্তে-আস্তে বাংলা, বিহার, ওড়িশা নবাবের হাত থেকে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে এল, একথা সবাই জানে। কিন্তু যুদ্ধ জয় করা এক, আর দেশের উপর শাসন বিস্তার করা অন্য জিনিস। ক্লাইভ দেশে চলে যাবার পরে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন। তখন কোম্পানির ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। মুঘল সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা আগেকার সম্রাটদের ক্ষীণ ছায়া মাত্র। দিল্লির বাদশাদের বলা হত শাহেনশা। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর মালিক, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় দিল্লির বাদশাহের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব দিল্লির চারপাশে কয়েক মাইলের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মের দিনে পুকুর প্রায় শুকিয়ে গেলে তার মাঝখানে যেমন একটু তলানি পড়ে থাকে।

বাদশাহ শাহ আলমের নাম আগে ছিল আলি গহর। তাঁর সম্বন্ধে একটি পুরনো ছড়া আছে :

বাদশাহ শাহ আলম্,
দিল্লিসে পালম।

অর্থাৎ নামেই বাদশাহ, কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্যসীমা হচ্ছে দিল্লি থেকে পালম গ্রাম পর্যন্ত। এখন যেখানে দিল্লির এয়ারপোর্ট হয়েছে, তারই পাশে। কয়েক বছর আগেও এয়ারপোর্টে আসবার সময় পুরনো পালম গ্রামের বাড়িঘর দেখা যেত। এখন প্রাচীর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, তাই পুরনো দিনের ছবি অল্পস্বল্পই চোখে পড়ে।

ছবি বিমল দাস

পলিয়ের (প্রাচীন চিত্র থেকে)

ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কে অনেক দুর্নাম আমাদের দেশে শোনা যায়। সেসব একেবারে মিথ্যা নয়। কোম্পানির তখন টাকা-পয়সার খুব অভাব ; যুদ্ধবিগ্রহ তো লেগেই আছে। তাঁকে অনেক সময় যে-উপায়ে টাকা যোগাড় করতে হয়েছে, তা প্রশংসনীয় নয়। অযোধ্যার বেগমদের উপর তিনি অনেক জবরদস্তি করেছিলেন, তাও সত্য। নন্দকুমারের ফাঁসির সঙ্গেও তাঁর নাম জড়ানো। সেসব সত্ত্বেও বলব, তাঁর অনেক সৎগুণ ছিল যা সাধারণত দেখা যায় না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীদের যে সাধারণ অবজ্ঞা, তিনি তার থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিলেন। চোদ্দ বছর বয়সে এদেশে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর হাতের লেখা ভাল ছিল আর অঙ্ক জানেন, এই বলে চাকরির দরখাস্ত করেছিলেন। তাঁর নিজের হাতের লেখা দরখাস্ত এখনও আছে। দেখলে মনে হবে হাতের লেখা সম্বন্ধে কথাটি মিথ্যা বলেননি। এদেশে এসে তিনি ফার্সি শিখেছিলেন। বাংলাও বলতে শিখলেন।

তিনি গভর্নর না হলে তখন সংস্কৃতের চর্চা কি আরবি-ফার্সির চর্চা বন্ধ হয়ে যেত। লেখাপড়ায় তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। সংস্কৃতের প্রতি তাঁর অনুরাগ কারুর চেয়ে কম ছিল না। তাঁর একজন বন্ধু ছিলেন, নাম আঁতোয়ান ল্যুই অঁরি পলিয়ের। নামেই বোঝা যাচ্ছে, পলিয়ের ইংরেজ ছিলেন না, তাঁদের পরিবার আসলে ফরাসি। কিন্তু তাঁরা সুইট্জারল্যাণ্ডে এসে বসবাস করছিলেন। ১৭৫৭ সালে অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের বছরে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে পলিয়ের চাকরি পান। তাঁর কাকা পল পূর্বে মাদ্রাজে কোম্পানির চাকরি করে গিয়েছেন। আঁতোয়ান ল্যুই পলিয়ের অর্থাৎ ভাইপো কিছুদিন দক্ষিণ ভারতবর্ষে চাকরি করেছিলেন। ১৭৬১ সালে তৃতীয় পেশোয়া প্রথম বাজিরাওয়ের সঙ্গে পানিপথে আহমদ শাহ আবদালির লড়াই হয়েছিল। এই লড়াইয়ে মারাঠাদের পরাজয় হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্রোত তার ফলে অন্য মোড় নিল। এই সময় আঁতোয়ান পলিয়ের সুবে বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় বদলি হয়ে এলেন।

কলকাতায় তখন নানারকম কাজের তোড়জোড় চলছিল। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের কাছে কোম্পানির যে পুরনো কেল্লা ছিল, তা নবাবের সৈন্যদের হাতে তখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আরও দক্ষিণে ময়দানে নতুন কেল্লা গড়বার চেষ্টা চলছিল। মাদ্রাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জন্ ব্রোহিয়ার কলকাতায় এসে কাজও আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজ বেশিদূর এগোয়নি। তাছাড়া তাঁর সম্বন্ধে গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, টাকাপয়সারও নাকি হিসাব-পত্র ঠিক নেই। এসব কথা হয়তো সত্যি, কারণ এক সুযোগে ব্রোহিয়ার কলকাতা থেকে পালিয়ে

খিদিরপুর ব্রিজ (প্রাচীন চিত্রের অনুলিপি) — ফোটো : বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

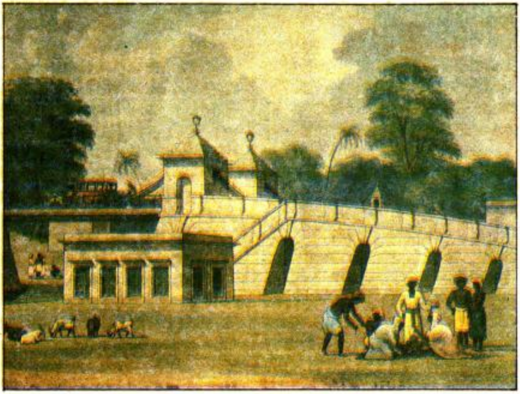

ফোটো : তপন দাস

ইডেন উদ্যানের ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড, প্রতি সন্ধ্যায় যেখানে গোরা সৈন্যদের ব্যাণ্ড বাজত

সিংহলে চলে গেলেন। সিংহল তখন ওলন্দাজদের হাতে। তাঁকে লোক পাঠিয়ে ধরে আনাও তাই সম্ভব ছিল না। বছর দুয়েক পলিয়ের কলকাতার দুর্গের কাজকর্ম দেখতে লাগলেন। তখন তিনি ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। পলিয়েরের অসুবিধা ছিল যে, তাঁকে কাজের জন্য যা টাকা দেওয়া হত, তাতে তাঁর খরচ কুলোত না। তাতে খাটবার লোকের অভাব ছিল। তা হলেও পলিয়ের ভাল করে কাজ করেছিলেন। নতুন দুর্গের যে প্ল্যান ছিল, তার সামান্য অদল-বদল করে নদীর ধারে একটি বড় গেট তৈরি করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এটিকে বলা হয় 'ওয়াটার গেট'। এর ফলে দুর্গ থেকে জাহাজ আসা-যাওয়ার খুব সুবিধা হয়েছিল। রবার্ট হজেস নামে এক চিত্রকর ১৭৮০ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি পলিয়েরের এই কাজের খুব প্রশংসা করে দিয়েছেন। পলিয়েরের তখন কাজকর্মে সুনাম হয়েছে। অযোধ্যার নবাবের একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ারের দরকার ছিল। তাঁর কাছে পলিয়েরের নাম প্রস্তাব করে পাঠানো হল। তখন অযোধ্যা রাজ্যে অনেক ইংরেজ চাকরি করতেন। নিজেরা ব্যবসা করে তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই খুব ধনী হয়ে উঠতেন। কিন্তু সবসময় ধর্মপথে নয়। পলিয়েরের আশা হয়েছিল, সবসময় তিনি চাকরি তো করবেনই, তাছাড়া অন্য ইংরেজদের মতো ব্যবসা করে রাতারাতি ধনী হয়ে যাবেন। তাঁর এ-স্বপ্ন সফল হয়নি। অল্পদিনের মধ্যে বোঝা গেল, তাঁর চাকরি নিয়ে কলকাতায় গোলমাল চলছে।

তখন কলকাতায় কোম্পানির রাজ্য চালাবার জন্য একটি ছোট কমিটি ছিল; তাকে কাউন্সিল বলা হত। কাউন্সিলের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে তিনজনই বললেন, পলিয়েরকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা উচিত, কারণ তিনি ওখানকার

আয়ুর্বেদ জগতের পথিকৃত

সাধনা ঔষধালয়ের ঐতিহ্যময় ইতিহাস প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম. এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ সি এস (লণ্ডন), এম সি এস (আমেরিকা)-র জীবনব্যাপী কর্মসাধনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মেধাবী ছাত্র শ্রী ঘোষ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাচীন শাস্ত্রের নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রতিফলিত করে আয়ুর্বেদীয় ঔষধপত্র তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন। সেই কর্মপ্রচেষ্টার বীজ আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সাধনা ঔষধালয় ৬৯ বৎসর ধরে দেশে অগণিত শাখার মাধ্যমে জনগণের সেবায় নিবেদিত।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রত্যেক অসুখের জন্য নির্দিষ্ট ঔষধের বর্ণনা আমাদের প্রাচীন সংহিতায় পাওয়া যায়। এইসব ঔষধ সেবনে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

আপনার রোগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমাদের চিঠি লিখুন। আশাকরি আমরা আপনার কষ্ট লাঘব এবং নিরাময়ে সাহায্য করতে পারবো।

মৃতসঞ্জীবনী
ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে
সকলপ্রকার দুর্বলতায়, অবসন্নতায়, রক্তহীনতায়, কঠিন রোগভোগের পর ও মেয়েদের প্রসবান্তে অমৃতের মত কাজ করে এমন দুটি অসাধারণ শক্তিশালী আয়ুর্বেদীয় রসায়ন।

69

সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা

দেশের সর্বত্র শাখা

প্রধান কার্যালয় : ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁকে এ ক্ষমতা কে দিল? ওয়ারেন হেস্টিংস অনেক প্রতিবাদ করলেন, পলিয়েরও কাউন্সিলকে জানালেন যে, এখন ফিরে গেলে তাঁর খুব টাকাপয়সার ক্ষতি হবে। তিনি অযোধ্যায় যে ব্যবসা করছিলেন, সে তো নতুন কিছু নয়, সব ইংরেজ কর্মচারীই এই কাজ করে থাকেন। কিন্তু ফল কিছুই হল না। অবশেষে আর কোনো উপায় রইল না, পলিয়ের কলকাতায় ফিরে এলেন। অল্পদিনের মধ্যে অযোধ্যার নবাবের টাকাপয়সার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। একবার কথা হয়েছিল, পলিয়েরকে আবার লখনউ ফেরত পাঠানো হোক, কিন্তু এই কারণে তা সম্ভব হল না।

পলিয়েরের দুঃখের দিন অবশ্য শেষ হয়ে আসছিল। কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে ওয়ারেন হেস্টিংস খুব প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন। পলিয়ের বিরক্ত হয়ে কিছুদিন আগে কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে ডেকে এনে লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেলের পদ দেওয়া হল এবং অযোধ্যায় থাকা সম্বন্ধেও কোনো নিষেধ রইল না। পলিয়ের তো খাঁটি ইংরেজ ছিলেন না। সেকথা আগেই বলেছি। খাঁটি ইংরেজ ছাড়া আর কাউকে লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেলের উপরের পদ পাবার যোগ্য বলে মনে করা হত না।

পলিয়ের এর পর থেকে বেশির ভাগ সময় লখনউয়ে থাকতেন। তাঁর অতিথি-সৎকারেরও প্রশংসা শোনা যায়। তখন ইংরেজরা কেউ কেউ ভারতীয় ভাষা ও ইতিহাস-চর্চা করতে ভালবাসতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে পলিয়েরের এ-বিষয়ে কিছু মিল ছিল। পলিয়ের অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৭৮৪ সালে যখন কলকাতায় ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যার উইলিয়াম জোনস নানারকম গবেষণার জন্য এশিয়াটিক্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন পলিয়ের প্রথম থেকেই তার সদস্য হয়েছিলেন। সে প্রায় দুশো বছর আগে, ১৭৮৪ সালে। এখন পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটির মস্ত বাড়ি। তখন সোসাইটির নিজের বাড়িঘর বলতে কিছু ছিল না। টাউন হলের কাছে সুপ্রিম কোর্টের বাড়িতে এশিয়াটিক সোসাইটির অফিস ছিল। পলিয়ের তো লখনউ থাকতেন, কাজেই সব অধিবেশনে আসতে পারতেন না। মাঝে-মাঝে এসে প্রবন্ধ পড়তেন, কিংবা আলোচনায় যোগ দিতেন। অল্পদিন পরে পলিয়ের ইউরোপে ফিরে গেলেন।

১৭৯৫ সালে একদল ডাকাতের হাতে পড়ে পলিয়েরের মৃত্যু হয়। ডাকাতরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল কেন, বলি। এদেশে থাকবার ফলে পলিয়েরের একটা খারাপ অভ্যাস হয়েছিল। তিনি এদেশের রাজারাজড়াদের দেখাদেখি পোশাকের সঙ্গে হীরা জহরতও ব্যবহার করতেন বিস্তর। সম্ভবত তারই লোভে ডাকাতরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল। পলিয়ের বেদের পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। সেসব লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যায়। প্যারিসে বিখ্যাত লাইব্রেরি বিবলিওথেক নাশিওনাল-এ তাঁর সংগৃহীত অনেক আরবি ফার্সি ও সংস্কৃত কাগজপত্র আছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে একটি সিন্দুকের মধ্যে তাঁর লেখা ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির একটি খসড়া পাওয়া গিয়েছে। সেটি ছাপা হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে পণ্ডিতদের অনেক পুরনো মূর্তি ও তৈলচিত্র আছে। পলিয়েরের কিন্তু নেই। মূর্তির কথা উঠছে না, কিন্তু একটি তৈলচিত্র থাকলে মন্দ হত না। তবু যা হোক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গ্যালারিতে পলিয়েরের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

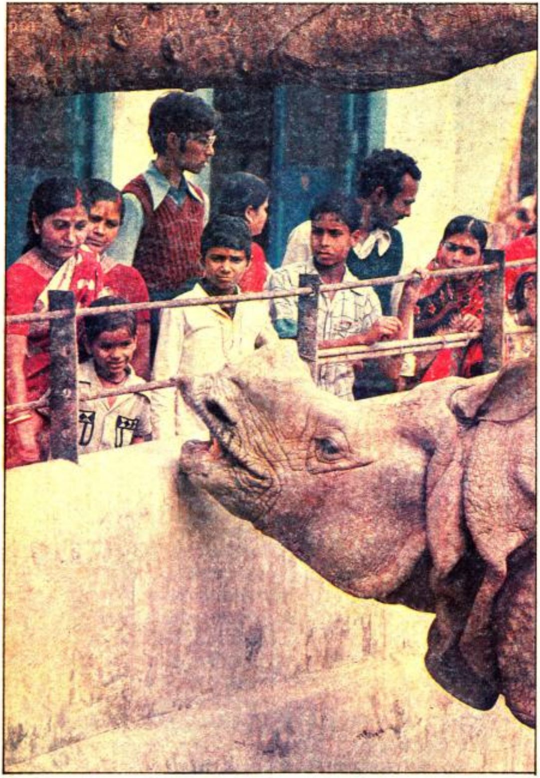

আলিপুর চিড়িয়াখানা। গণ্ডারের রেলিংয়ের ধারে দর্শকদের ভিড়

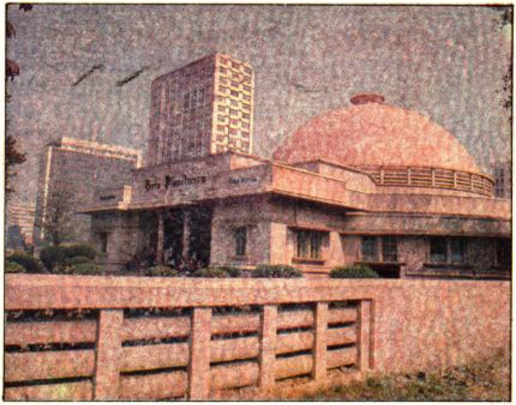

বিড়লা তারামণ্ডল। ঢুকে পড়লেই গ্রহতারার হদিস পেয়ে যাবে

তোমাদের হাতেই কলকাতা

পবিত্র সরকার

আমার ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের অনেকের মতন আমি কলকাতায় জন্মাইনি, সেইখানে তোমরা জিতে গেছ।

কিন্তু আমি কলকাতার পোষ্যপুত্র—কীভাবে এসে যেন ভিড়ে গেছি এখানে। কলকাতার মায়া কাটিয়ে আর বেরুতে পারব বলে মনেও হয় না।

আমাদের গ্রামের যাঁরা কলকাতায় চাকরি করতেন তাঁরা ছুটিছাটায় গ্রামে ফিরে বলতেন, কলকাতায় কোথাও এক ইঞ্চি মাটি নেই, সমস্ত শহরটা আগাপাস্তলা বাঁধানো। মাটি পয়সা দিয়ে কিনতে হয় সেখানে। বলতেন, কলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ মেলে। আমরা বড় জোর ছাগলের দুধ খেয়েছি পেটরোগা ছিলুম বলে, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতুম, "বাঘের দুধ কারা খায়?" তাঁরা বলতেন, "কেন, সাহেবরা!"

চাকুরে কাকা-জ্যাঠারা বলতেন, কলকাতায় একধরনের গাড়ি আছে, তারে ঝুলতে-ঝুলতে যায়, তার নাম 'ট্রাম'। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করতুম, "লোকভর্তি গাড়ি, তার ছিঁড়ে পড়ে যায় না কখনো?" তাঁরা বলতেন, "পাগল! সাহেবদের তৈরি গাড়ি যে!" তাঁরা বলতেন, কলকাতায় দোতলা বাস চলে, তার ছাদটা খোলা।

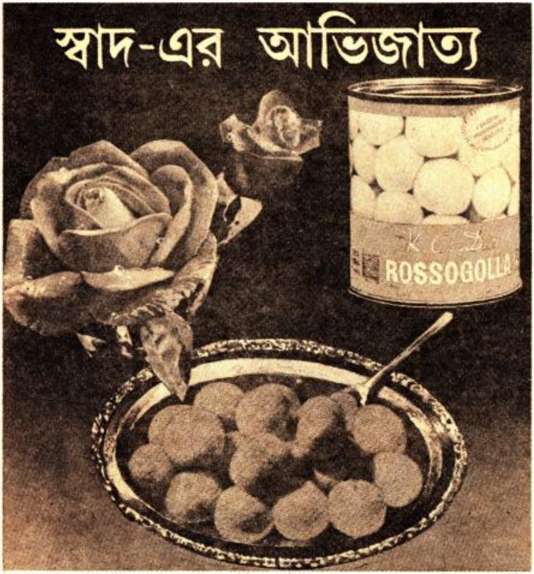

বাংলার ঐতিহ্যময় মিষ্টান্ন শিল্পে দাশ পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাগবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র দাশ রসগোল্লার উদ্ভাবন করেন। তাঁরই পুত্র কে সি দাশ এই শতাব্দীর সূচনায় সমতুল স্বাদের রসোমালাই আবিষ্কার করেন। স্বদেশের মিষ্টান্নের স্বাদ বিদেশের রসিকমহলে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে টিনে রসোগোল্লা সংরক্ষণের অভিনব রীতি তাঁরই প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক ভাবনার সুফল। আজও এই প্রতিষ্ঠান নব নব প্রচেষ্টায় নিরত। সাম্প্রতিকতম সার্থক প্রয়াস মিষ্টান্নরসবঞ্চিত ডায়াবেটিক রোগীদের তৃপ্তিসাধনে শর্করাবর্জিত বিশেষ মিষ্টান্নের সংযোজনা।

কে· সি· দাশ প্রাঃ লিঃ

ব্যাঙ্গালোর শাখা
৪৮, সেন্ট মার্কস রোড ফোন : ৫৫০০৩

কলকাতা শো-রুম
১১, এসপ্লানেড ইস্ট ফোন : ২২-৫৯২০

সেখানে সিটে আরাম করে বসে বাবুরা পেট ভরে ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বাড়ি ফেরেন। সেখানে বাড়িগুলো এত উঁচু যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা যায় না। সে-সব বাড়ির ছাতে ফুটবল খেলা হতে পারে।

কলকাতায় আছে লাটসাহেবের বাড়ি, ময়দান, চিড়িয়াখানা আর জাদুঘর। চিড়িয়াখানা আর জাদুঘর কী? না চিড়িয়াখানায় থাকে জ্যান্ত জিনিস, আর জাদুঘরে সব মরা জিনিস।

সে ছিল না-দেখা শহর, রূপকথার শহর, স্বপ্নের শহর। তারপর তো মফস্বলের ছেলে আমরাই এক সময় কলকাতার পুষ্যি হয়ে গেলাম। কলকাতার জাদুও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এল। আগে ছিল "বাড়ি, গাড়ি, রাস্তা পাতা—তিনে শহর কলিকাতা।" তারপর দেখলুম "কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি। তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ।" দেখতে পেলুম, "রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি।" দেখলুম, কলকাতার আকাশ টুকরো-টুকরো, রাস্তা ফুটো-ফাটা। একটু বৃষ্টি হলেই নোংরা জল কোমর ছুঁতে চায়। ক্রমে কলকাতা হল বস্তি বাজার ঘিঞ্জি গলি, ভিড় এড়িয়ে কোথায় চলি? রাস্তাঘাট নোংরা-ভরা, বৃদ্ধ শহর শ্যাওলা-পড়া; ট্রামে বাসে বাদুড় ঝোলে, লোকে থাকে পাগল বলে।

তবু কী এক মায়ায় জড়িয়ে নিল বুড়ি কলকাতা। থাকতে ভাল লাগে, দূরে গিয়ে বেশিদিন মন টেকে না। আমেরিকার নিউ অরলিয়েন্জ শহরের লোহার রেলিং-দেওয়া বারান্দাওয়ালা বাড়ি আর ট্রাম দেখে কলকাতার জন্য মনটা হু-হু করে ওঠে, ইতালির ফ্লোরেন্স রেল স্টেশন থেকে বেরিয়েই চেনা নামের জুতোর দোকান দেখে লাফিয়ে উঠি, রোমের এক গলিতে রাত দেড়টার সময় দুই বুড়ির বাজখাঁই গলার তুমুল ঝগড়া কলকাতার জন্যে মন-খারাপ তৈরি করে দেয়। প্যারিসের সাঁজেলিজের অজস্র আলোর প্যাটার্ন, কিংবা টোকিওর পাতাল রেলের ভেলভেট-মোড়া নরম গদির সিট দেখে ভাবি, হায়, আমার কলকাতার বুড়ির চেহারা কবে খসে যাবে, কবে সে মায়ের মতো সুন্দর হবে?

কলকাতায় এসে দেখি, তাকে তো আমরাই রেখেছি নোংরা করে, বুড়ি সাজিয়ে। আমরা পানের পিক ফেলছি রাস্তায়, দেয়ালে। নাকের শিকনি মুখের কফ ছুঁড়ে দিচ্ছি পথের মাঝখানে। ট্রামবাসের টিকিট, সিগারেটের প্যাকেট, ডাবের খোলা, ফুচকা-আলুকাবলি-ঘুঘনির এঁটো শালপাতা, আখের ছিবড়ে, কাটা ফল আর কমলালেবুর খোসা, ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পল,—সব ফেলে রাখি রাস্তায়। তোমরা ছোটরা এসব ক'রো না, আমরা বড়রা করি। ঐ আমাদের আনন্দ। বাসের জানলা থেকে থুথু কফ ছুঁড়তে আমাদের আনন্দ, তিনতলা থেকে ফুটপাথে মানুষের মাথায় বাড়ির নোংরা ফেলতে আমাদের আনন্দ। পার্ক থেকে ফুল ছিঁড়তে গাছ উপড়ে নিতে, পার্কের লোহার রেলিং দুমড়ে বেঁকিয়ে দিতে আমাদের বিপুল আনন্দ। যত উড়ালপুল করি, রাস্তা বানাই, পার্ক বসাই, আকাশ-গুঁতোনো বাড়ি তুলি—এইসব ফূর্তির ব্যাপার না ছাড়লে কলকাতার কালিমা ঘুচবে না।

একটাই আশা আছে শুধু। আমরা চলে যাব আমাদের নোংরা এসব অভ্যাস নিয়ে, কিন্তু তোমরা যারা এগুলো শেখোনি, তারা কলকাতাকে সুন্দর রাখবে। তোমরা খেয়াল রেখো, আমাদের অভ্যাসগুলো যেন তোমাদের না শেখাতে পারি আমরা। তোমরা সুন্দর করে তোলো কলকাতাকে, সুন্দর করে রাখো। তোমাদের হাতে কলকাতাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই।

গঙ্গার উপরে ঝুঁকে রয়েছে দ্বিতীয় সেতুর মুখ। কাজ চলছে দুই মুখকে জুড়ে দেবার

কলকাতার কথা

সমর বসু

ইংরেজিতে একটা কথা আছে : রোম নগরী একদিনে তৈরি হয়নি। কোনো শহরই একদিনে তৈরি হয় না। কলকাতা সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

ওপরের কথাটা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি হল যে, কোনো নগরী একদিনে নষ্ট হয় না। কলকাতার যে দুরবস্থা, সেটাও একদিনে হয়নি।

আগে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কলকাতা। কিন্তু ইংরেজরা সেটা সরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লিতে। তারপর থেকেই কলকাতার অবস্থা একটু-একটু করে খারাপ হয়েছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাগ এবং ১৯৬০-৬৫তে মন্দা হওয়াতে এই শহরটার ওপর ভীষণ রকম চাপ সৃষ্টি করেছে। তা সত্ত্বেও অবস্থাটা বেহাল হত না। যদি সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হত।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, কলকাতার দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ কারও হয়নি। কাজেই জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ, কিন্তু জলের সরবরাহ বাড়েনি। নতুন রাস্তাঘাট হয়নি তো বটেই, পুরনোগুলিও সংস্কারের অভাবে ভেঙে চুরে গেছে। জলনিকাশি ব্যবস্থা আগের চেয়েও খারাপ, কারণ ড্রেনের মধ্যে ময়লা জমে জমে তাদের নিকাশি-ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। উপনগরী তো দূরের কথা, গৃহনির্মাণের দিকেও তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

এক কথায় কলকাতা শহরটা অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছে, অবহেলায়

নষ্ট হয়েছে এবং কলকারখানা ব্যবসাবাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় শহরটা দিনে-দিনে গরিব হয়ে গেছে।

কিন্তু চিরকাল অবহেলা করবার মতো শহর কলকাতা নয়। সমস্যা আছে বলেই সমস্যার সমাধান করতে হয়। এই কলকাতা শহরে ৩৩ লক্ষ লোকের বাস। আর মহানগরীর হিসেব করলে জনসংখ্যা এক কোটির ওপর (মহানগরী বলতে প্রায় ১৪৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা, দক্ষিণে বজবজ থেকে উত্তরে কল্যাণী পর্যন্ত বোঝায়। আর শহর-কলকাতার আয়তন হল ১০৪ বর্গ কিলোমিটার মাত্র) এই এক কোটি লোকের কথা ভাবতেই হবে, কারণ মহানগরীর এই অংশে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ লোকের বাস। এখানেই রাজ্যের রাজধানী, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।

এই বিপুল জনসংখ্যার অনেকগুলি মৌলিক চাহিদা আছে। প্রত্যেকেরই চাই খাদ্য, চাই পানীয় জল, পরিবহণ, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা আর রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা।

তোমরা হয়তো 'পরিকল্পনা' কথাটা শুনে থাকো, কিন্তু এর তাৎপর্য সব সময় পরিষ্কার হয় না। পরিকল্পনা কথাটার মানে

ব্রেবোর্ন রোডের ফ্লাই-ওভার, যানবাহনকে যা রবীন্দ্রসেতুর মুখে দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছে

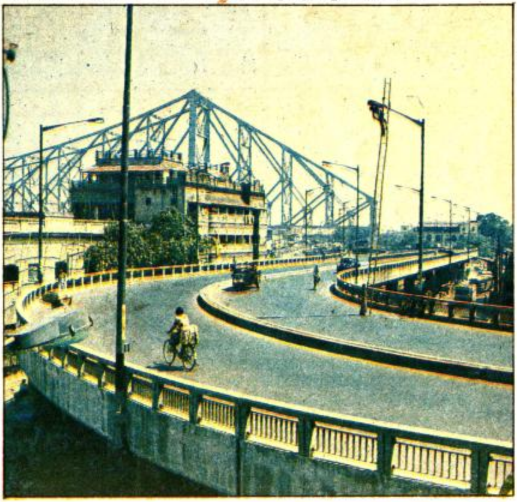

আর কিছু নয়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে এমনভাবে ছক কেটে এগোতে হবে, যাতে সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা যায়। তোমরা যেমন পড়াশুনা করছ, ধাপে ধাপে এগোচ্ছ ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

একটা হিসেবে দেখা গেছে যে, আজকে যদিও মহানগরীর জনসংখ্যা এক কোটি ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে (অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর শেষে) এটা প্রায় দেড় কোটির কাছাকাছি দাঁড়াবে। এই যে বর্তমান জনসংখ্যা, এর প্রয়োজন তো মেটাতেই হবে, আর নতুন যে ৫০ লক্ষ লোক বাড়বে, তাঁদের প্রয়োজনের কথাও বিবেচনা করতে হবে। শুধু বিবেচনা নয়, তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে পরিকল্পনামাফিক।

স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অরগানাইজেশন বা সি এম পি ও নামে যে সংস্থা তৈরি হয়, তাঁরা তখনকার এবং ভবিষ্যৎ কলকাতার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধান: করে একটা পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনায় ছিল ভগ্নপ্রায় নগরজীবনের আশু প্রয়োজন মেটানো এবং ভবিষ্যতে যাতে নগরজীবন বিপর্যস্ত না হয় তারও ব্যবস্থা করা।

ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এবং ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ওয়াটার অ্যাণ্ড স্যানিটেশন অথরিটি মহানগরীর উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করেছিলেন, এরপর এল ১৯৭০ সালে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ.)।

এই সি. এম. ডি. এ. গত ১২ বছরে কলকাতা উন্নয়নের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের জানা দরকার। সমস্যাগুলি জটিল এবং বহুদিনের অবহেলার ফলে জট

চাই ভাবনা, চাই কৌতূহল

সি এম ডি এ সম্পর্কে আনন্দমেলায় বিজ্ঞাপন লেখা হয়। সেই লেখা তোমরা পড়। কিন্তু লেখার উৎপত্তি হলো কি করে সে কথা জান কি ? লেখার যে একটি ইতিহাস আছে আজ সেই কথাটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

আজকে যে লেখা আমরা লিখছি লেখার এই রূপ কিন্তু তার জন্মের সময়ে ছিল না। বহু বহু বছর আগে তার বদলে ছিল কতগুলো টুকরো ছবি। যেমন সূর্য আঁকলে বোঝানো হতো 'একদিন'। চাঁদের ছবি দেখলে পড়তে হতো 'এক মাস'। মানুষের পা মানে হাঁটা। অনেকগুলো ছবি পর পর এঁকে একটা বিষয় বলা হতো।

মিশরীয়রা এই পদ্ধতিটাকে প্রতীক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করলেন। সেসবও কিন্তু ঢের ঢের আগেকার কথা। তাঁরা ছবি আঁকার মধ্যেই অনেকরকম চিহ্ন ব্যবহার করা শুরু করলেন। আর এই আজকে যে লিখে তোমাদের কাছে লেখার ইতিহাস বিষয়ে গল্প বলা যাচ্ছে এ'রকমের জন্ম হয়েছে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। এই লেখার সঙ্গে ছবির কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য টানা লিপিতে ছবির আভাস থাকে। ভেবে দেখলে সব জিনিষেরই একটা ইতিহাস আছে। অর্থাৎ তার জন্ম ও বিকাশের পর পর ঘটনা আছে। জানতে চাইলে যে কলম দিয়ে লিখছো, যে মাথা (মস্তিষ্ক) দিয়ে ভাবছ, যে জামাটা গায়ে দিয়েছো তারও বিষয় জানবার আছে। শুধু থাকা চাই আগ্রহ, কৌতূহল। তাহলে কলকাতা শহর সম্বন্ধেও আগ্রহ থাকবে না কেন ?

জনসংযোগ বিভাগ সি এম ডি এ

৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস কলিকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে প্রচারিত

পাকিয়ে গেছে। প্রয়োজনের তলনায় সি. এম. ডি. এ. বা অন্যান্য সংস্থার কাজ যথেষ্ট নয়। তাহলেও গত ১২ বছরে কলকাতা মহানগরীর সর্বত্র উন্নয়নমূলক বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। একদিকে রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, ফ্লাইওভার বানানো হচ্ছে, আর অন্যদিকে মাটির তলায় জলের পাইপ, জল ও মল নিকাশি ড্রেন ইত্যাদি বসছে। শুধু তাই নয়, বিরাট বিরাট জলসরবরাহ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে (গার্ডেনরিচ ও হাওড়া), দ্বিতীয় হুগলি সেতু রূপ নিচ্ছে আর ভারতবর্ষের প্রথম পাতাল-রেল চালু হবে এই কলকাতাতেই। তিনটে উপনগরীও নির্মিত হচ্ছে।

একদিকে যেমন কলকাতা উন্নয়নের দায়িত্ব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ওপর (সি. এম. ডি. এ, কলকাতা কর্পোরেশন, সি. আই. টি, মেট্রো রেল ইত্যাদি) তেমনি নাগরিকরাও অনেকভাবে শহরটাকে ভাল করতে সাহায্য করতে পারেন।

কতকগুলি উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা যখন-তখন যেখানে-সেখানে জঞ্জাল ফেলতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস না বদলালে কলকাতার দুর্গন্ধ আর দুর্নাম কখনও ঘুচবে না। বহু পবিশ্রম করে বহু অর্থব্যয় করে জলের যে ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জলের অপচয়ের জন্য। অন্য কোনো শহরে এইভাবে জল নষ্ট হয় মা। কলকাতার জনসংখ্যা এবং যানবাহন সংখ্যা এত বেশি যে, এখানে পরিবেশ দূষণ হবেই। তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিকার হল প্রচুর সংখ্যায় গাছ লাগানো। অথচ সেদিকে সকলের দৃষ্টি নেই।

কলকাতা সম্বন্ধে যখনই কোনো আলোচনা হয় তখনই কতকগুলি প্রশ্ন এবং কথা শোনা যায়। এর জবাবগুলি সকলেরই জেনে রাখা ভাল।

প্রথম, কলকাতা শহরে এত জঞ্জাল কেন? এর জবাব আগেই দিয়েছি। প্রধান কারণ হল, আমরা যখন-তখন, যেখানে-সেখানে জঞ্জাল ফেলে থাকি। এই শহরে দিনে আড়াই হাজার টনের মতো জঞ্জাল জমে। কলকাতা কর্পোরেশনের জঞ্জালবাহী লরিগুলি দিনে একবার এগুলি সাফ করে, কিন্তু দিনেরাতে জঞ্জাল পড়লে কোনো পুর প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই দিনরাত্রি শহর সাফ রাখা সম্ভব নয়। এখানে নাগরিক সচেতনতার একটা বড় প্রশ্ন আছে।

দুই, কলকাতার ট্রামে-বাসে এত ভিড় কেন? এর সহজ উত্তর হল, চাহিদার তুলনায় ট্রাম-বাস কম। সেই সঙ্গে আর-একটা কারণ হল, অধিকাংশ অফিস এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান শহরের একাংশে অবস্থিত। কাজেই সেইদিকে চাপটা বেশি হবেই।

তৃতীয়, কলকাতা শহরে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই জল জমে কেন? এর সহজ উত্তর হল, বৃষ্টিপাতের তুলনায় জলনিকাশি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়।

চতুর্থ, কলকাতায় এত খোঁড়াখুঁড়ি কেন? উত্তরে বলি, বহুদিনের সমস্যার কিছুটা সমাধান করবার চেষ্টা হচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। তাই এত খোঁড়াখুঁড়ি।

শেষ প্রশ্ন হল কলকাতার ভবিষ্যৎ কী? এটাই হল সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। তবে জেনে রাখা ভাল যে, একটা শহরের ভবিষ্যৎ অনেকগুলি জিনিসের ওপর নির্ভর করে। সেই শহরের সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সাফল্য এবং কর্মবহুলতার ওপর নির্ভর করছে শহরের ভবিষ্যৎ। এর সঙ্গে কিন্তু যোগ করতে হয় সেই শহরের বাসিন্দাদের সচেতন কর্মপ্রয়াস, সাধারণজ্ঞান এবং সুচিন্তা।

তোমরা যারা ছোট, তাদের কাছে একটা আবেদন। তোমরা এই শহরটা সম্বন্ধে আরও জানবার চেষ্টা করো এবং শহরটা যাতে ভাল হয় তার জন্য তোমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করো।

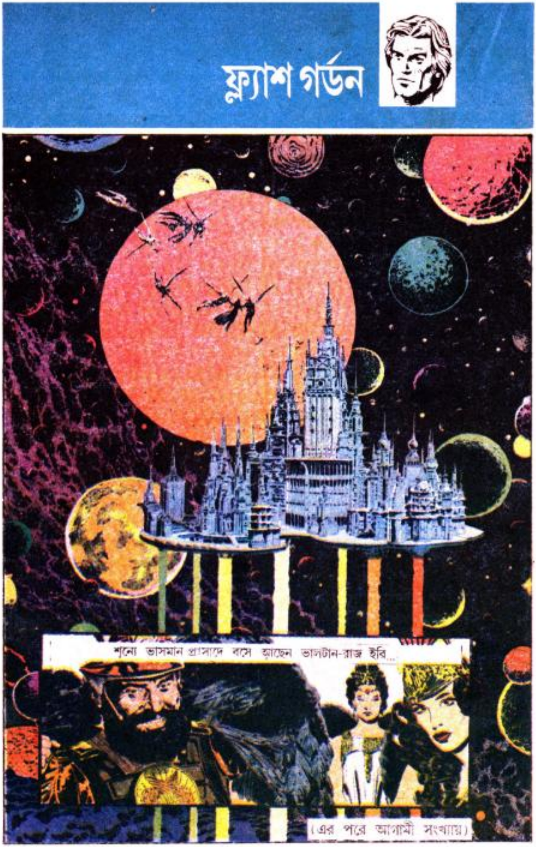
ফ্ল্যাশ গর্ডন
শূন্যে ভাসমান প্রাসাদে বসে আছেন ভালটান-রাজ ইবি...
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রাস্তার ছেলে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রানী ডাকল, ও দাদা, শিগ্‌গির আয়, দেখে যা। সেই ছেলেটা আবার এসে বসে আছে! আবার কেমন হাসছে দ্যাখ। এই যা বলছি। চলে যা। ওখানে বসবি না। মা বকবে। কী বেহায়া রে বাবা, যাচ্ছে না। রানী জানালা দিয়ে একটা ইঁটের টুকরো ছুড়ে দিল!

কী হচ্ছে রে? বুমবাই জানালায় এসে রানীর পাশে দাঁড়াতেই দেখল, ছেলেটা দিব্যি মাথায় পুঁটুলি দিয়ে তাদের রোয়াকে শুয়ে আছে। মা বলেছে, রাস্তার ছেলেরা ভাল হয় না। বাবা শাসিয়ে গেছেন, এখানে কী করতে—কী চাই। যাও। আর কখনও আসবে না। রানী, বুমবাই ধরেই নিয়েছে হতচ্ছাড়া কোনো ছেলে-ধরার চরটর হবে। দু-দিন থেকে এ জায়গাটায় আস্তানা গেড়েছে।

স্কুলে যাবার সময় দেখেছিল, রোয়াকটা খালি। স্কুল থেকে ফেরার সময়ও দেখেছে খালি। বাবার ধমক খেয়ে সটকে পড়েছে। বাড়ির সদর গেট বন্ধ থাকে। স্কুলে যাবার সময় খোলা হয়। স্কুল থেকে ফিরলে খোলা হয়। বাবার গাড়ি ঢুকলে খোলা হয়। মা-বাবা বেড়াতে গেলে খোলা হয়। বাকি সময় বন্ধ থাকে। মনসা শুধু সব সময় সতর্ক থাকে, গেট খোলা রাখা নিরাপদ নয়। কেউই খুলে রাখে না। গেট পার হলে দুটো রোয়াক দু পাশে। কর্তাবাবার আমলের বাড়ি। পুরনো ফ্যাশনের। এখন এই রোয়াকটা বাড়ির জ্বালা হয়েছে। যত ভবঘুরে, ভিখিরি মাঝে-মাঝে এসে

আমেলা-২ (২৯. ৬. ৮৩)

এখানটায় আস্তানা গাড়ে। মনসাজেঠুর কাজই হল গে তাড়িয়ে দেওয়া। এবারে মনসাজেঠুর কী হয়েছে কে জানে, ছেলেটাকে দেখলে তাড়া করে যায় না। গেটের কাছে গেলে দেখতে পেলে তাড়া করা দরকার ভেবে সেদিকটায় সহজে মাড়াতেই চায় না। মা কত বলেছেন, মনসাদা, তুমি দেখতে পাও না ? মনসাজেঠু বলেছে, হ্যাঁ বৌমা, দেখতে পাই। দেখলে তো তাড়িয়ে দিই। আবার কখন এসে বসে থাকে ! কী যে বিপত্তি, বলেন বৌমা !

বুমবাই চিৎকার করতে থাকে, না মা, মনসাজেঠুর কিছু বলে না। মিছে কথা বলছে। মনসাজেঠু বলেছে, যা মিছে কথা বলেছি তো বেশ করেছি। পুরনো আমলের চাকর। বাবাও হম্বিতম্বি করতে পারে না। বাড়ির ভাল-মন্দ মনসাজেঠুর চেয়ে কেউ বেশি বোঝে না। অগত্যা দুই ভাই-বোনের কাজ হয়েছে দেখতে পেলে হম্বিতম্বি করা। দোতলার জানালা থেকে রোয়াকটা স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে আরও সুবিধা। সকালে স্কুলে যাবার সময় দেখেছে নেই। বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখেছে নেই। এখন কিনা সাঁঝ লাগতে না লাগতেই আবার ফিরে এসেছে।

বাড়িটার চারপাশে উঁচু পাঁচিল। কাঁটাতারের বেড়া। বড় নিরাপদ জায়গা। একটাই আপদ এখন এই রোয়াকে। মনসাজেঠুর নির্বিকার ভাব বুমবাইয়ের ভাল লাগছে না। সে বড় হয়ে গেছে বলে বোঝে, মানুষজন সব কখনও ভাল হয় না। ক্লাস সিক্সে পড়লে কত কিছু জানা যায়। স্কুলের বন্ধুরা ছেলে-ধরার খুব গল্প করে। সবার মা-বাবাই বলে দিয়েছে, রাস্তায় লোকজনের সঙ্গে কথা বলবে না, কিছু দিলে খাবে না। বুমবাই কিছু খায় না। রানীটা হ্যাংলা—পাকা তেঁতুলের আচার পেলে চুরি করে খাবেই। ঐ একটাই ভয়—রানীটাকে

নিয়ে। সে কিছু মানতে চায় না। রানীকে বুমবাই বলে দিয়েছে, লক্ষ রাখবি আসে কি না! সেই থেকে রানীর কাজই হয়েছে দোতলায় এলে জানালা থেকে না হয় ব্যালকনি থেকে উঁকি দিয়ে দেখা আপদটা আবার ফিরে এসেছে কি না!

বুমবাই বলল, যা তো, নীচ থেকে নিয়ে আয়, ফুরিয়ে গেছে। মোরাম-বিছানো রাস্তা থেকে বেশ বড় বড় দেখে ক'টা পাথর কোঁচড়ে করে নিয়ে এসেছে রানী। দাদার সামনে খুলে ধরেছে। বুমবাইয়ের টিপ দারুণ। সে ব্যালকনি থেকে চিৎকার করছে, যাও, না হলে পাথর ছুড়ব। গায়ে লাগলে আমি কিছু জানি না। ছেলেটার পরনে হাফ-প্যান্ট। খালি গা। এই বুমবাইয়ের বয়সীই হবে। হোক, এরা ভাল হয় না কখনও। রাস্তার ছেলে ভাল হয় সে কখনও শোনেনি। কিন্তু ছেলেটা কেমন ওর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে না। বুমবাই ফের বলল, সর বলছি। লাগলে কিন্তু আমি জানি না কিছু। কী, সরবি না। উঠবি না! এত আস্পর্ধা! বলেই সে ঢিল ছুড়ল। লাগেনি। পাশে শানে লেগে ঠন করে উঠল। পরেরটা, কামিনীফুলের গাছটার ডালে লাগল। কী সাহস! এতটুকু নড়ছে না। দেখাচ্ছি। এই রানী, তুইও হাত চালা। ভাই-বোন মিলে ঢিল ছুড়তে থাকলে কেমন শিলাবৃষ্টি যেন শুরু হয়ে গেল। ছেলেটা জবুথবু হয়ে বসল। ছোট্ট পুঁটুলিটা বুকের মধ্যে রেখে জড়সড় হয়ে বসে থাকল। তবু নেমে গেল না।

রানী বলল, আয় দাদা, নীচে যাই, কাছে হবে।

না, খবর্দার নীচে নামবি না। তুক-তাক জানতে পারে। দেখছিস না, একটা ঢিল গায়ে লাগছে না। আবার নিয়ে আয়।

রানী দৌড়ে নেমে গেল। সে উপর থেকে শাসাতে থাকল, আসুক বাবা, দেখাচ্ছি তোমাকে। পুলিশে খবর দেব জানো। তখন দেখবে থানায় নিয়ে যাবে। এমন মারবে না, হাত-পা ভেঙে দেবে। দেখব তখন কী করে এখানে এসে বসে থাকতে পার!

ছেলেটা একটা কথাও বলছে না। কারণ তার বলার কিছু নেই। সে শুধু কাতর চোখে তাকিয়ে থাকতে পারে। সে শুধু জবুথবু হয়ে বসে থাকতে জানে।

রাস্তায় বাস-ট্রাক যাচ্ছে। মানুষজন শহরে ব্যস্ত। সে শুধু বসে আছে রোয়াকে। রানী গেছে নীচে পাথর আনতে। এতগুলো পাথর ছুড়ে একটাও জায়গামতো মারতে পারেনি। কে জানে ছেলেটা হয়তো ভেবেছিল, পাথর ছোড়া যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন কেউ আর তাকে কিছু বলবে না। সে বেশ নিবিষ্ট মনে পোঁটলা খুলে দু-খান শুকনো রুটি চিবুতে বসে গেল। আর তখনই দেখল, বারান্দা থেকে, বাবুর ছেলেমেয়েরা আবার ঢিল ছুড়ছে। ছোট মানুষ, ঢিল তত জোরে হচ্ছে না। সে নিশ্চিন্তে খেতে পারে। মাঝে-মাঝে খুব কাছাকাছি এসে পড়লে, সে সরে বসে আবার খাওয়ায় মন দিচ্ছে।

রানী বলল, দ্যাখ দিকি দাদা, একটু যদি ভয় থাকে!

দাঁড়া না দেখাচ্ছি। এদিকে আয়।

আরও সুবিধামতো জায়গায় গিয়ে ওরা দাঁড়ায়। সামনের গ্রিলটাই যত নষ্টের গোড়া। ওটা না থাকলে, কখন পাখিটাকে কাবু করে ফেলত। জবরদখল বের করে দিত।

রানী বলল, দাদা, এদিকটায় আয়। দেখ মাথা গলানো যাচ্ছে।

তাই তো! বুমবাইয়ের খেয়ালই নেই। গ্রিলটা এখানে অনেকটা ফাঁকা। নতুন গ্রিল বসাবার কথা। এই হবে হচ্ছে করে এতদিন

পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। বুমবাই মাথাটা বের করে হাতদুটো বের করে নিল। তারপর ফের চিৎকার, সরে যা বলছি। বাবা বারণ করে গেছে না এখানে আসতে!

কে কার কথা শোনে! রুটি চিবুচ্ছে। পোঁটলার মধ্যে কী খুঁজছে আঁতিপাঁতি করে। ও মা, বেটা কত ধুরন্ধর। একটা কাঁচা লঙ্কা না কী যেন কামড়ে কত আরাম করে খাচ্ছে দ্যাখো। খাওয়া তোর বের করে দিচ্ছি। বুমবাইয়ের রাগ জানো না। রাগলে সে কী করতে পারে জানো না। বলেই সাঁই করে একটা পাথর ছুড়ে মারল। ছেলেটা একবার আঁ করে উঠল। কপালে লেগেছে। নাকের তলায় ক' ফোঁটা রক্ত পড়তে দেখেই বুমবাই কেমন স্থবির হয়ে গেল। রানী বলল, ইশ, দাদা তুই কী করলি! বুমবাই রেগে গিয়ে বলল, বেশ করেছি। উঠছে না কেন! কিন্তু বুমবাই আর ঢিল ছুড়তে পারল না। সে ব্যালকনিতে ঝুঁকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। রানী দেখল, ছেলেটা কপালের রক্ত মুছে আবার খাওয়ায় মন দিচ্ছে। রানী আর ওখানে দাঁড়াতেও সাহস পেল না। সে ছুটে নীচে নেমে যাবার সময় বলল, দাদা তুই ছেলেটাকে মারলি! মার কাছে গিয়ে বলল, জানো মা, দাদা না ছেলেটার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে।

কোন্ ছেলের?

ঐ যে ছেলেটা! তুমি যে বলতে কী আপদ এসে জুটেছে!

তাই বলে কপাল ফাটিয়ে দেবে! কী ডাকাত ছেলে রে বাপু! তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দেখলেন, বুমবাই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

এই ডাকাত ছেলে, তুই মারলি কেন?

বুমবাই বলল, মারবই তো, একশোবার মারব। ও বসে থাকে কেন? ওর মা-বাবা নেই কেন। একা কেউ বসে থাকে!

তাই বলে তুই মারবি। কপাল ফাটিয়ে দিবি! কোথায় ছেলেটা!

রানী বলল, আমার সঙ্গে এসো, দেখাচ্ছি।

কিন্তু বুমবাইয়ের মার পা উঠছে না। কেমন হতাশ গলায় বললেন, না না, আমি দেখতে পারব না! তারপর বুমবাইকে ঝাঁকিয়ে তুলে বললেন, তোমাকে কে মারতে বলেছে। পাজি হতচ্ছাড়া! তোমাকে কে বলেছে, বলো কে বলেছে মারতে?

বুমবাই খেপে গিয়ে বলল, তোমরা বলেছ। বাবা বলেছে! আমার কী দোষ! আমি কি ইচ্ছে করে মেরেছি। আমার কি মারতে ইচ্ছে হয়। আমি মারব কেন! বলে সে ছুটে বের হয়ে গেল। তারপর রাত বেড়েছে। বুমবাই, রানী এবং তার মা কেউ আর সাহস করে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বুমবাইয়ের কিছু ভাল লাগছিল না। সে খেতে বসে খেতে পারল না। বাবা বললেন, তুমি বড় অন্যায় করেছ। ছেলেটাকে তো আমি দেখলাম না!

মা বললেন, কোথাও গেছে, আবার ফিরে আসবে।

বুমবাই কী ভাবল কে জানে। তার মন জীবনেও এত খারাপ হয়নি। কী কাতর চোখ! সে মাকে বলল, মা চলো না দেখে আসি। বলে কিছু বাড়তি খাবার নিয়ে গেটের কাছে গিয়ে দেখল, ছেলেটা নেই। চলে গেছে। বুমবাইয়ের হাতে খাবার। সে নিজে বসে খাওয়াবে ভেবেছিল। ছেলেটা যখন সত্যি খারাপ না তখন তার সঙ্গে বুঝি বন্ধুত্ব করা যায়। কিন্তু রোয়াকটা ফাঁকা। কেউ নেই। কেবল কামিনীফুলের গাছটার ডাল হাওয়ায় নড়ছে। তাদের রোয়াকটা এবং বাড়িটা এত হতকুচ্ছিত এর আগে তার এমন একদিনও মনে হয়নি। তার আজ বাড়িতে কেন জানি ঢুকতে ভয় লাগছে!

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

বটুবাবুর ছাতা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

রোজকার ট্রেনের যাত্রী বটুবাবু বেশ জোরে পা চালিয়ে স্টেশনের দিকে চলেছিলেন। নটা পাঁচের ট্রেনটা না হলে ধরা যাবে না।

অবশ্য পরের ট্রেনে গেলেও ক্ষতি নেই। ঠিক সময়েই পৌঁছানো যাবে। তবে বটুবাবুর তিরিশ বছরের চাকরি-জীবনে তিনি তিরিশ দিনও লেট করেছেন কিনা সন্দেহ।

বেশ খানিকটা হাঁটার পরেই বটুবাবুর মনে হল রোদ্দুরটা আজ বড় চড়া। একটা ছাতা হাতে থাকলে ভাল হত। আসলে ছাতা বটুবাবুর বারো মাসের সঙ্গী, কিন্তু আগের ছাতাটা পুরনো হয়ে যাওয়ায় আর ব্যবহার করার মতো নেই। নতুন একটা কিনবেন-কিনবেন করেও কেনা হয়ে ওঠেনি, টানাটানির সংসার।

এবার মাইনে পেলেই শস্তার একটা ছাতা কিনে ফেলবেন ঠিক করলেন বটুবাবু। কেমন যেন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে ছাতা হাতে রাখা। না থাকলেই হাত কেমন খালি-খালি লাগে।

স্টেশনের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন বটুবাবু। স্টেশন দেখা যাচ্ছিল। ঠিক তখনই আধ-ময়লা লুঙ্গি পরা একটা লোক হাতে একটা ছাতা নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

"ছাতা কিনবেন বাবু? খুব শস্তা," লোকটা বলল।

"ছাতা?" বটুবাবু ছাতাটা লক্ষ করে বলে উঠলেন। ভাবলেন, লোকটা আমার মনের কথা জানল কী করে?

"হ্যাঁ বাবু, চমৎকার ছাতা, খুব শস্তা।"

বটুবাবুর একটু লোভ হলেও থিতিয়ে গেলেন যেই ভাবলেন পকেটে মাত্র দশটা টাকাই আছে। এখনও মাসের দুদিন বাকি। একটা ছাতা আজকালকার দিনে অন্তত কুড়ি টাকা।

লোকটা যেন বটুবাবুর মনের কথা জেনে নিয়েই বলে উঠল, "খুব শস্তা বাবু, মাত্র সাত টাকা দেবেন। খুব ভাল বেতের ছাতা।"

বটুবাবু লোভে পড়েই ছাতাটা একবার হাতে নিলেন।

সত্যিই চমৎকার ছাতা। এমন ছাতা মাত্র সাত টাকায় দিচ্ছে লোকটা?

লোকটা বলে উঠল, "নিয়ে নেন, বাবু, একটাই আছে। আর আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাই।"

বটুবাবু আর কথা বাড়ালেন না, পকেট থেকে সাতটা টাকা বের করে লোকটাকে দিয়ে দিলেন।

বটুবাবু এবার ছাতাটা খুলে মাথায় দিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করতেই ছাতাওয়ালাকে আর দেখতে পেলেন না। মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল বটুবাবুর, সত্যিই শস্তায় পাওয়া গেছে ছাতাটা, আজকালকার দিনে ভাবাই যায় না।

স্টেশনে আসতেই বটুবাবু দেখলেন ট্রেন এই এল বলে। টিকিট কাটার তো আর ঝামেলা নেই, মাসিক টিকিট কাটা আছে।

ট্রেন এসে পড়তেই বটুবাবু একটা কামরা ফাঁকা দেখেই তাতে উঠে পড়লেন। আশ্চর্য হওয়ার তাঁর তখনও বাকি ছিল। গত পনেরো বছরের জীবনে যা পাননি তাই পেয়ে গেলেন। উঠেই বসার জায়গা পেলেন। অফিস-টাইমের ভিড়ে এ তো হাতে একেবারে চাঁদ পাওয়ার মতো।

নাই নাই ভয়
***পিনট্যাব* করেছে জয়**
পেটের যতেক রোগ।
তোমার খাবার জলে
একটি বটিকা দিলে
রবে না দুর্ভোগ॥

এক গ্লাস জলে একটি অথবা এক কলসি জলে পাঁচটি পিনট্যাব বড়ি ফেলে আধঘণ্টা পরে সেই জল খাও। ব্যস্। পেটের রোগ থেকে নিশ্চিন্ত।

২০০, ৫০০, ১০০০, ৫০০০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

এমসনস্ ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিমিটেড
১৪৪এ রাসবিহারী এ্যাভেন্যু
কলকাতা-৭০০০২৯ ফোন—৪৬-৭৯১০

জাতির প্রতি ২৬ বছরের সেবার প্রতীক

শিয়ালদায় নেমে হাজার-হাজার লোকের পিছনে বটুবাবুও বাইরে এসে রাস্তায় নামলেন।

এবার আবার হাঁটা। তবে রোদ্দুরের ভয় আর নেই, নতুন ছাতাটা আছে।

আর ঠিক তখনই একটা প্রাইভেট বাস বটুবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। কণ্ডাক্টর চিৎকার করে লোক ডাকছিল : আসুন, বিবাদী বাগ, একদম খালি গাড়ি।

বটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। এমনকী বসতেও পেলেন। ছাতাটা বেশ পয়মন্ত তো ! ভাবলেন বটুবাবু।

অফিসে নিজের জায়গায় গিয়ে বসতেই কয়েকজন সহকর্মী এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। "কই বটুদা, মিষ্টি খাওয়ান।"

বটুবাবু অবাক হয়ে তাকালেন। "মিষ্টি খাওয়াব ? কেন ভাই ?"

"হুঁ বটুদা, ওসব শুনছি না। আপনি বড়বাবু হয়েছেন আর আমাদের ফাঁকি দেবেন ?"

একটু পরেই শুনলেন বটুবাবু। বটুবাবুর এতদিনের কাজের স্বীকৃতিতে তিনি আজ থেকে বড়বাবুর পদে প্রোমোশন পেয়েছেন। বটুবাবু ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, তাই কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

বটুবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই খাওয়াব ভাই। মাইনেটা পাই।" বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন বটুবাবু—"কী সব ঘটছে ! ছাতাটা দেখছি আমার ভাগ্যই বদলে দিয়েছে।" তাঁর কেমন একটা ধারণা জন্মে গেল ছাতাটার জন্যই এমন হচ্ছে।

বিকেলে ছুটির পরে আবার শিয়ালদামুখো হলেন বটুবাবু। এবার আর গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করলেন না। হেঁটে স্টেশনে যাওয়ার অভ্যেস তাঁর বরাবরের। শরীরটাও ভাল থাকে। হাজার-হাজার মানুষের সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন বটুবাবু হাতে ছাতাটা নিয়ে।

স্টেশনে এসেই দেখলেন পাঁচটা বত্রিশের গাড়িটা এই ছাড়ল বলে। আর মিনিটখানেক বাকি।

প্ল্যাটফর্ম বেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলেন বটুবাবু যদি শেষ কামরাটাতেও ওঠা যায়। পরের ট্রেন আবার ছটা পাঁচে।

হঠাৎ বটুবাবুর মনে হল কেউ যেন পিছন থেকে টানছে। তিনি এগোতে গিয়েও পারছেন না। পিছনে কিন্তু কেউ নেই। তাহলে মনেরই ভুল।

বটুবাবু এবার প্রায় ছুটে গিয়ে ট্রেনের শেষ কামরায় উঠে পড়লেন। ট্রেন ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

হাঁফাতে-হাঁফাতে এবার ভিতরে ভিড় ঠেলে ঢুকলেন বটুবাবু। কামরাটায় বেশ ভিড়। একজন তাঁকে কোনোমতে বসার

কিশোর-ক্লাসিক

আগামী সংখ্যা থেকে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বার হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব কিশোর-ক্লাসিকের সারানুবাদ। সঙ্গে থাকবে লেখক-পরিচিতি এবং গ্রন্থ-পটভূমির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। লেখকদের তালিকায় আছেন রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, জোনাথন সুইফ্‌ট, জুলে ভের্ন, ড্যানিয়েল ডিফো, মার্ক টোয়েন, সেরভান্তেস, স্টো এবং আরও অনেকে। ভাষান্তর করেছেন শেখর বসু।

জায়গা করে দিতে বটুবাবু বসে পড়লেন। যাক আর মাত্র আধ ঘন্টা—তারপরেই বাড়ি। ছাতাটায় ভর রেখে জানলার বাইরে তাকালেন বটুবাবু।

পরের স্টেশনে পৌঁছবার আগেই ট্রেনটা আস্তে আস্তে থেমে গেল। হয়তো সিগন্যাল নেই। এই এক ঝামেলা! একটু ঝিমুনি এসেছিল বটুবাবুর। তাই কী যে ঘটে গেল সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন না। তারপরেই ভয়ংকর একটা শব্দ উঠতেই ছিটকে পড়লেন বটুবাবু। মনে হল, কেউ যেন একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কামরাটা যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। কামরার মধ্যে জেগে উঠল কাতর আর্তনাদ: বাঁচাও! বাঁচাও! কামরার যাত্রীরা যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। সভয়ে লক্ষ করলেন রক্তাক্ত, বীভৎস একটা দৃশ্য!

দাঁড়িয়ে-থাকা তাঁদের ট্রেনের পিছনে অন্য কোনো ট্রেন এসে ধাক্কা মেরেছে—বুঝতে পারলেন বটুবাবু। ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে।

কিন্তু তিনি কি বেঁচে আছেন? সারা শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল বটুবাবুর। তাঁর গায়ের উপর পড়ে-থাকা কয়েকজন যাত্রীকে ঠেলে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন বটুবাবু। তাঁর জামা-কাপড় রক্তে মাখামাখি। কামরাটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছে।

প্রায় গড়াতে গড়াতে কামরার বাইরে লাইনের উপর এসে পড়লেন বটুবাবু। হাজার-হাজার মানুষ চারদিকে ছুটোছুটি করছে। থেকে থেকে আর্তনাদ ভেসে আসছে—আহ্! বাঁচাও! বাঁচাও!

কোথা থেকে কী হয়ে গেল! টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন বটুবাবু। তিনি সত্যিই বেঁচে আছেন। তাঁর কোনো আঘাত লাগেনি, এটাই আশ্চর্য। ট্রেনের দুটো কামরা প্রায় চূর্ণ হয়ে গেছে।

দু'চোখে জল এসে গেল বটুবাবুর। এই কিছুক্ষণ আগে যাদের সহযাত্রী হয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তাদের সবাই কি বেঁচে আছে? এর মধ্যে কি কারও বেঁচে থাকা সম্ভব?

ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন বটুবাবু, সত্যিই তিনি এই ভয়ানক দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েও সম্পূর্ণ অক্ষত আছেন। অন্যান্য আহত যাত্রীদের রক্তই তাঁর জামা-কাপড়ে লেগেছে। মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলেন বটুবাবু। কিন্তু কোন্ অলৌকিক কারণে তিনি বেঁচে গেলেন? এ কেমন করে সম্ভব? কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারলেন না তিনি।

পরক্ষণেই বটুবাবুর নজর পড়ল হাতে-ধরা সেই নতুন ছাতাটার উপর। ছাতাটা তাঁর হাতছাড়া হয়নি।

অদ্ভুত মমতায় ছাতাটা বুকে চেপে ধরে সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে দূরের স্টেশনের আলো লক্ষ করে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। কেউ তাঁকে লক্ষ করল না, সবাই তখন উদ্ধার-কাজে ব্যস্ত।

এই ছাতাটাই আজ বটুবাবুকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে সন্দেহ রইল না তাঁর। না হলে চূর্ণ-বিচূর্ণ ওই কামরায় বটুবাবুই শুধু অক্ষত রইলেন কী করে? ওই ভয়ংকর আঘাতে তাঁরও তো রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হওয়ার কথা ছিল।

অবশ মন নিয়ে শেষবারের মতো পিছনে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন বটুবাবু। সারা জীবনেও এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারবেন না তিনি। একটা কথা তাঁর কেবল মনে পড়ছিল—ছাতাটাই বোধ হয় তাঁকে ট্রেনে উঠতে বাধা দিয়েছিল আগেই, তিনি বুঝতে পারেননি।

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

ন্যাড়া কলকাতা

সুনীলকুমার নন্দী

ন্যাড়া কেন এ-কলকাতা, জানতে চাইছ ?
বলছি, শোনো :
যেমন করে হঠাৎ কেউ-বা জংলাছায়ায়
কিংবা কোনো
পাহাড়খাদে শিকার হয়-না, আমরা তেমন
সকাল-সন্ধে
যখন-তখন এ-কলকাতায়, এক পলকের
অসতর্কে
শিকার হচ্ছি বাসের থাবায় ; এবং ভিড়ে
পাড়ির সাঁতার
কাটতে-কাটতে কার-যে নিপুণ কাঁচির টানে
পকেট সাবাড়

শুধু কি তাই ? এ-কলকাতায় এমনি কত
কী আজগুবি
হাঁ-মুখ ঢেউয়ের দস্যিপনা চলছে, দেখো
ভরাড়ুবি
জেনেও আরে যায় না রোখা, কে রোখে কোন
তালকানা ফাঁক—
এসব ভেবেই এ-কলকাতার পড়ছে মাথায়
হয়তো এ-টাক ।

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

এ-কলকাতা

রঞ্জন ভাদুড়ী

এ-কলকাতা সে-কলকাতায়
তফাত আকাশ-পাতাল।
পাতালে সে বাড়াচ্ছে পা,
আকাশটা তার চাতাল।
সাবওয়ে তার নাগরা-জুতো,
উড়ালপুলের টুপি
মাথায় পরে কলকাতা আজ
যেন গায়েন গুপি।
গাঙ-ওপারে হাওড়া যে তার
সঙ্গী বায়েন বাঘা,
পরবে এবার দুজন মিলে
দ্বিতীয় সেতুর তাগা।
এ-কলকাতায় তুলছে মাথা
অনেকতলা বাড়ি,
আর কটা দিন সবুর করো
চলবে পাতাল-গাড়ি।

চলন্ত সব সিঁড়ির উপর
যেই দাঁড়াবে তুমি
শুনতে পাবে পাতাল-রেলের
ঝুমঝুম ঝুমঝুমি।
পাতালপুরীর ইস্টিশানে
নামিয়ে দেবে সিঁড়ি।
এ-কলকাতা নেই তো বসে
হয়ে আসনপিঁড়ি—
দশদিকে সে ছুটছে দ্যাখো
দিগ্বিজয়ীর মতো
আদাড়-বাদাড় জংলা-জলায়
গড়ছে বসত কত!
কলকাতা না কালকেতু সে—
বাড়ছে দিনে-দিনে
তোমাদের এই কলকাতাকে
নাও তো এবার চিনে!

ভাড়াটে খেলোয়াড়

সুতপন চট্টোপাধ্যায়

ফাইনাল খেলার দিন বাপ্পা জ্বরে পড়ল। সন্তুর দলে সে সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। বাপ্পা খেলতে না পারলে সন্তুর দল হারবেই। কিন্তু সন্তুর দু-তিন ঘণ্টা অন্তর সারা গায়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। ডাক্তার বলেছে তার পক্ষে মাঠে নামা একেবারেই অসম্ভব। তাহলে! সন্তু পড়ল মহা বিপদে। সন্ধেবেলা সে দলের সব বন্ধুদের ডাকল। কী করা যায়। কেউ কোনো উত্তর দিল না। দেবে কী করে। কেউ কি বাপ্পার মতো চৌকস ফুটবলার? কিন্তু এবার সন্তু প্রতিজ্ঞা করেছে—জিতবেই। গত বছরের শোধ। কী করে জিতবি। সন্তু গোল-কিপার মানুকে জিজ্ঞাসা করল।

চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে উঠল। কদমতলার হাট থেকে দলে দলে মানুষ বাড়ি ফিরছে। বারোয়ারি তলায় শান-বাঁধানো বেদির উপর বসে সন্তু মানুকে লক্ষ করে বলল,"একটা কিছু করতেই হবে। হারলে চলবে না। মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না তোর?"

মানুর চোখে-মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। অন্য সময়ে সন্তু মানুর কাছে নানান ব্যাপারে জোরালো বুদ্ধি ধার নেয়। পরে মার্বেল ও লাট্টু দিয়ে শোধ করে। কিন্তু এখন সে চুপচাপ বসে। সন্তু আবার বলল, "কী রে, কিছুই খেলছে না?"

মানু এবার সন্তুর মুখের উপর চোখ রেখে বলল, "শোন, হায়ার করবি?"

"হায়ার? কাকে?"

"রবিকে। চল না বলে দেখি—"

"কোন্ রবি?"

"সেই যে, সন্তোষপুর দলে খেলে। মাইলখানেক দূরে থাকে।"

"চল"—বলে মানু আর সন্তু বেরিয়ে পড়ল। আঁকা-বাঁকা মেঠো রাস্তা। আবছা অন্ধকার। কিছুটা আগে একটা গোরুর গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির নীচে একটা হ্যারিকেন অন্ধকারে দুলছে। কিছুটা দূরেই সার সার তালগাছ। মাঝে-মাঝেই কলাগাছের বন। শুকনো পাতার খস-খস

শব্দ। কানের পাশ দিয়ে হাওয়া বইছে। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। আবছা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

ডি ভি সি ক্যানেলের ছোট্ট ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরল সন্তু আর মানু। কিছুটা এগোতেই মানুর চোখে পড়ল পাশাপাশি দুটো তালগাছের মধ্যে একটা সাদা তালগাছ। আরো একটু কাছাকাছি গিয়ে তারা অবাক হয়ে দেখল, তালগাছ তো নয়—একটা লম্বা লোক। দুটো তালগাছের গুঁড়িতে পা রেখে একবার মাথা ঠেকাচ্ছে মাটিতে, একবার আকাশে। বুক দুর-দুর করে উঠল সন্তুর। চুপিচুপি সে মানুকে বলল, "চল মানু, আমরা পালাই—আমার ভয়-ভয় করছে।"

মানুর কিন্তু দারুণ সাহস। সে চট্‌পট্ জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি?"

"আমি জন ফিগ্‌ম্যান—ব্রাজিলের লোক" হালকা হেসে লোকটা বলল। নামটা খুব চেনা-চেনা লাগল সন্তুর। মানু আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে কী করছ?"

"বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, একটু ব্যায়াম করে নিচ্ছি।"

"ও আবার কী ধরনের ব্যায়াম?"

"খেলোয়াড়দের অনেক রকম ব্যায়াম করতে হয়। তোমরা বড় হও, বুঝবে।" ফিগ্‌ম্যান বলল। ঠিক তখনি সন্তুর মনে পড়ল ফিগ্‌ম্যান মানে ফুটবলের জাদু। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফিগ্‌ম্যান মানে অবধারিত গোল। ফিগ্‌ম্যান মানে ফুটবলের ইন্দ্রজাল। এসব ভাবতে ভাবতে সন্তু দারুণ উত্তেজনায় বলল, "আচ্ছা, তুমি সেই ফিগ্‌ম্যান যার গোলে ব্রাজিল বহুবার অলিম্পিক জিতেছে?"

লোকটা হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমিই সেই ফিগ্‌ম্যান—তুমি তো আমাকে চেনো দেখছি!"

এবার সন্তু ও মানু খুব গদগদভাবে বলল, "আপনাকে চিনব না?"

"দেখ না কবে ব্রাজিল থেকে এসিছি—কেউ আমাকে চেনে না।" বলে সে হতাশার শব্দ করল। তারপর বলল, "তা, তোমরা চললে কোথায়?"

"খেলোয়াড় হায়ার করতে," মানু বলল।

সন্তুর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বার হচ্ছে না। চোখের সামনে ফিগ্‌ম্যানকে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। একটু পরে নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে সে খুব নম্রভাবে বলল, "আমরা ভীষণ বিপদে পড়েছি। বাপ্পার জ্বর। আপনি দয়া করে আমাদের হয়ে খেলবেন? নইলে আমরা হেরে যাব।"

"আমি—আমি কি পারব?" আমতা-আমতা করল ফিগ্‌ম্যান।

"খুব পারবেন। একটু ইচ্ছে করলেই পারবেন।" মানু বলল।

"আপনাকে আমাদের হয়ে খেলতেই হবে। আমরা ছাড়ব না।" —ভীষণ পীড়াপীড়ি করল সন্তু। রাজি হয়ে গেল ফিগ্‌ম্যান। তবে একটা শর্ত। সারা মাঠে দৌড়তে পারবে না। বয়স হয়েছে তো। গোলের মুখে বল ফেলতে হবে। তারপরই গো—ল।।

"তা ক'টা গোল চাই?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল ফিগ্‌ম্যান। সন্তু কানে কানে মানুকে বলল, "এক ডজন বলি?" এক মিনিট চিন্তা করে মানু বলল, "না—বেশি বলিস না। বয়স হয়েছে তো—না পারলে ওর বদনাম হয়ে যাবে। কম করে বল।"

"অন্তত চারটে।" বলেই মনে মনে সন্তু ভাবল কম করে দশটা তো হবেই। মাঠের নাম, সময় ও বোসপাড়ার নাম বলে বাড়ি ফিরল। সারা রাত উত্তেজনায় সন্তু ও মানুর ঘুম এল না।

পরদিন কাঁটায়-কাঁটায় চারটে। বুক

রেফারি বাজিয়ে দিল বাঁশি। আরম্ভ হল ফাইনাল। কানায় কানায় ভরে গেছে মাঠের চারদিক। পশ্চিম দিকে মাঠের ধারে লাল শামিয়ানার নীচে সাজানো শিল্ড-কাপ। মাঠের চার কোণে লাল পতাকা। হাতে হাতে ছোট ছোট লাল কাপড়। বেশ উঁচুতে পত পত করে উড়ছে ক্লাবের ময়ূরপঙ্খী ফ্ল্যাগ। যেখানে বল সেখানে সন্তু। পায়ে বল নিয়ে কখনো সে ড্রিবল, কখনো থ্রু, কখনো মাটি ঘেঁষে কিক করে গোলের মুখে বল ফেলার চেষ্টা করছে। মাঝে-মাঝেই ফরোয়ার্ড অমলকে বল ঠেলে চিৎকার করছে, "গোলে লব কর—।"

বোসপাড়ার ছেলেরা কম কিসে? মাঝে-মাঝেই সুন্দর বোঝাপড়া করে তারা হানা দিচ্ছে সন্তুদের গোলে। অতর্কিতে জোরালো আক্রমণ করছে। উত্তেজনা বাড়ছে। চারপাশ থেকে চিৎকার উঠছে। ঠিক দশ মিনিটের মাথায় সন্তু একটা বল দুজনকে কাটিয়ে ব্যাক পাশ করল অমলকে। চোখের নিমেষে অমল জোরালো শট নিল গোল লক্ষ করে। সন্তু চিৎকার করল—ফিগ্। বলটা তীরবেগে যেতে যেতে হঠাৎ বাঁই করে ঘুরে সোজা জড়িয়ে গেল জালে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সন্তু। চারপাশে তখন চিৎকার গোল। সন্তু ছেঁড়া সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে মনে মনে বলল 'এক'। উত্তরের গোলের পিছনে সন্তুর বন্ধুরা কালি-পটকায় আগুন লাগাল আনন্দে।

বিরতির পর দিক-বদল হয়ে গেল। সন্তুরা চলে এল উত্তরের গোলে। বোসপাড়ার দক্ষিণ দিক। আবার জোর লড়াই। সন্তু সবাইকে বলল, "আরো তিনটে গোল চাই। গোলের মুখে বল দে—গোল হবেই। সবাই যেভাবে পারছে বল পাঠাচ্ছে গোল লক্ষ করে। সতর্ক বাজপাখির মতো প্রতিটি বল আটকে দিচ্ছে

ফুলিয়ে মাঠের মধ্যে নামল সন্তুর দল। ফাঁকা গোলে দশবার বল পাঠিয়ে সন্তু সারা মাঠকে জানিয়ে দিল আজ সে জিতবেই। পাঁচ মিনিট পরে টস্ করল রেফারি। সন্তুরা চলে এল মাঠের দক্ষিণ গোলে। সন্তু চিৎকার করল একবার "ফিগ্—উত্তর দিক।" ঠিক সেই মুহূর্তে সেণ্টারে বসিয়ে

Happy Family with
Bijoli Grill
ICECREAM SODA
LEMONADE
ORANGE
VITO
Bijoli Grill Beverage

বোসপাড়ার গোলকিপার। উত্তেজনা বাড়ছে সন্তুর। সে সারা মাঠ ছুটে বেড়াচ্ছে বলের পিছু পিছু। এরই মধ্যে বোসপাড়ার স্টপার সুন্দর থ্রু করল লেফ্ট-আউট লক্ষ করে। গড়ানে বল আচমকা শট নিল একজন। এমন অব্যর্থ শট যে এক পলকের মধ্যে মানুর নাগাল এড়িয়ে সোজা গোল। সমান সমান।

সন্তু ব্যাক লাইন সতর্ক করল। ফরোয়ার্ডদের কানে কানে বলল 'আক্রমণাত্মক' খেলো। হাফ লাইন থেকে সে ক্রমাগত বল জুগিয়ে দিচ্ছে ফরোয়ার্ডদের। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। চিনের প্রাচীরের মতো বোসপাড়ার ডিফেন্স। এদিকে বোসপাড়ার ছেলেরা জেতার জন্য মরিয়া। বারবার হানা দিচ্ছে উত্তরের গোলে। হঠাৎ একটা বল একজন হেড করে পেনাল্টি বক্স থেকে গোলে পাঠালে বলটা উঁচু হয়ে বারের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মানু চেষ্টাই করল না। মুহূর্তে বলটা হাওয়ার ধাক্কায় বেশ কিছুটা নিচু হয়ে বারের নীচে লেগে জড়িয়ে গেল জালে। এক গোলে পিছিয়ে পড়ল সন্তুরা।

অনিবার্য কারণে 'রুআহা' এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।

খেলা শেষ হতে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি। বোসপাড়ার ছেলেরা পরপর পেয়ে গেল একটা ফ্রি-কিক, একটা কর্নার। দুটো সুযোগই তারা কাজে লাগাল। আরো দুটো গোল। হতাশায় ভেঙে পড়ল সন্তু। দিশেহারার মতো সে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা মাঠ। এই ফাঁকে দিনের সবচেয়ে সুন্দর ব্যাকভলি করল বোসপাড়ার স্টপার। গোলের মুখে জটলার মধ্যে নিখুঁত শটে দিনের শেষবারের মতো বলটা জড়িয়ে গেল উত্তর দিকের জালে। খেলা শেষ। মাঠ থেকে দৌড়ে পালাল সন্তু। সে মুখ দেখাবে কী করে?

রাত সাড়ে-সাতটায় চুপিচুপি সন্তু আর মানু গেল ফিগম্যানের সঙ্গে দেখা করতে। যেতে যেতে মানু বলল, "ফিগম্যান অসুস্থ হয়ে আগে চলে আসেনি তো?" সন্তু কোনো উত্তর দিল না। চুপচাপ ওরা তালগাছের কাছে এসে দেখল ফিগম্যান পায়ের হাড় ম্যাসাজ করছে আপনমনে। ওদের দেখেই ফিগম্যান একমুখ হেসে বলল "কী খুশি তো? চারটের বদলে পাঁচটা গোল দিয়েছি। একটা বেশি।" শুনে তো সন্তু আর মানু অবাক। দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, "তার মানে?"

"হ্যাঁ, তবে একটা গোল আমি অফ-সাইডে দিয়েছি। রেফারি ধরতে পারেনি।"

মানু বলল, "কিন্তু—"

ফিগম্যান দুঃখ করে বলল, "কী করব বলো—এত কম সময় তোমরা খেলো। আর একটু সময় পেলে আরো পাঁচটা দিতাম।" তারপর বলল, "অনেক দিন পরে গোল দিতে কী ভালই না লাগছিল।"

শুনে রাগে রি-রি করে উঠল সন্তু, "তুমি জানো কাদের গোল দিয়েছ।" ফিগম্যান খুব অবাক হয়ে তাকাল সন্তুর দিকে। তারপর বলল, "কেন? উত্তর দিকের গোলে?"

কান্না পেয়ে গেল সন্তুর। ধরা-ধরা গলায় বলল, "হাফ্-টাইমে যে দিক বদলে যায় তুমি তা জানো না?"

দু-মিনিট চুপ করে রইল ফিগম্যান। তারপর হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "ঠিক বলেছ তো! একেবারেই ভুলে গেছি। ইশ, তা কবে ফুটবল ছেড়েছি, সব নিয়ম কি মনে থাকে?" ফিগম্যান আফশোস করল।

সন্তু রাগে গরগর করতে করতে বলল, "এই সাধারণ নিয়মটাই ভুলে গেছ? ভূত কোথাকার।"

ছবি : অনুপ রায়

সকাল থেকে নিজের ঘরে বই গোছাচ্ছিল ছোট্কা। আমি ঢুকতেই গুনগুন করে গেয়ে উঠল, "আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি, আমার··· এসো সতুবাবু। যখন প্রথম ধরেছে কলি—" ছোট্কা হঠাৎ গানটাকে আবৃত্তি করে বলল, "কলি মানে কী, বুঝলে সতুবাবু ?"

"কলি মানে তো কুঁড়ি।" আমার জানাই ছিল, তাই উত্তর দিতে দেরি হল না।

"উঁহু। হল না।" ছোট্কা হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "কলি মানে হল চুনকাম। আমি সেই মানেটাই অন্তত বোঝাতে চেয়েছি।"

ও হরি, এতক্ষণে আমার কিছুটা বোধগম্য হল। গত দু-দিন ধরে আমাদের সারা বাড়িতে চুনকাম হয়েছে। ছোট্কার বইপত্রগুলি সব নামিয়ে ফেলা হয়েছিল। সেইজন্যই ছোট্কা গাইছিল—'যখন প্রথম ধরেছে কলি।' গাইছিল আর বই গোছাচ্ছিল।

আর বই গোছাতে গিয়েই ছোট্কার মাথায় চট করে কখন যেন একটা ধাঁধা থেকে গেছে।

সেই ধাঁধাটাই দিচ্ছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ একজনের টেবিলের সামনে একটা ছোট্ট বুকশেলফ। দুটো তাক সেই শেলফে।

লোকটির রয়েছে ৯ খণ্ড সাধারণ জ্ঞানের বই। প্রত্যেক খণ্ডের উপর ১ থেকে ৯ পর্যন্ত লেখা।

লোকটি প্রথমে ওপরের তাকে রাখল ৬, ৭, ২ ও ৯ খণ্ড। নীচের তাকে ১, ৩, ৪, ৫ ও ৮ খণ্ড। এতে একটা দারুণ মজার ব্যাপার হল। ওপরের সংখ্যাগুলোকে ঠিক দ্বিগুণ করলে নীচের সংখ্যা হয়। ৬৭২৯ × ২ = ১৩৪৫৮।

এই মজাটা মনে রেখে বলতে পারো, বইগুলোকে দুটো তাকে আর কীভাবে সাজানো যায়, যাতে ওপরে যে সংখ্যা হবে, তার ঠিক তিনগুণ হবে নীচের তাকের খণ্ডগুলোর সংখ্যা ?

সাধারণত অবশ্য বইয়ের তাকে পরপর ন'খণ্ডই সাজাবার কথা। কিন্তু শুধু মজার জন্য দুটো তাকে একটু এলোমেলো করে সাজানো। খুব শক্ত ধাঁধা কিছু নয়। সুতরাং বলে ফেলো।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ আগের ধাঁধাটার মতোই, বলতে হবে যে, ১ থেকে ৯ খণ্ড বই আরো কীভাবে দু-তাকে রাখলে নীচের খণ্ডগুলোর সংখ্যা হবে ওপরের তাকের সংখ্যার চারগুণ ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—জচুখিগাড়ি

গতবারের উত্তর (১) ১৬০ জন। (২) বৈত(নিক)টস্থ। (৩) যারপরনাই।

সত্যসন্ধ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
বসরানের লোকদের ধারণা, স্থায়ী কোচ হয়ে রয় সেখানেই থেকে যাবে !
এত কী ভাবছ বলো তো !
রোভার্সকে ছেড়ে কীভাবে থাকব, তাই ভাবছি !
তোমার কথা এদের বুঝিয়ে বলোনি ?
এরা বুঝতে চাইছে না !
এদের বিশ্বাস, আমি এখানেই থাকব !
সামনেই কিরিয়ার সঙ্গে খেলা ! আমি থাকব না শুনলে এরা মুষড়ে পড়বে!
খেলোয়াড়দের কোচ করতে চলেছে রয়...
তুমি ফিরে যেতে চাইলে আমি আপত্তি করব না !
ধন্যবাদ!
মিনিট কয়েক বাদে...
কারা যেন আসছে...
এ যে অনেক লোক !
স্পোর্টস্ কার থেকে নামলেন ক্রীড়ামন্ত্রী তৌফিক...
এই গাড়ি আপনার জন্য !
পিছনের সিট দুটো দেখুন...
ওখানে আপনাদের বাচ্চারা বসবে !
সে কী!
বাড়ির মধ্যে কারিগররা কাজে লেগেছে...
ওই টেলিফোনে সরাসরি ইংল্যান্ডের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন ! ফ্রি !
এ তো ভাবাই যায় না!

বিঙ্গো খেলারও ব্যবস্থা করেছেন দেখছি !
সবই আপনার জন্য !
তৌফিকের সহকারী জনান্তিকে বলছে...
মাছভাজার যন্ত্রও বসিয়ে দিলুম !
FISH'N CHI
CHIPS
COD
HADDOCK
PLAICE
SALT
VINEGAR
PEPPER
বেশ করেছ, একে খুশি রাখা চাই !
আশা করি, ইনি বসরান থেকে ফিরতে চাইবেন না !
মধ্যপ্রাচ্য-টুর্নামেন্টে বসরান বনাম কিরিয়া...
বসরান !
রয় মাঠে নেমেছে...
মনে রেখো, গোটা দল একমন হয়ে খেলবে !
9
নিশ্চয় !
সূচনাতেই বসরান চেপে ধরেছে...
মুখতার দারুণ পাস করেছে !
গোলে মারো রয় !
কিন্তু...
আঃ !
এ কী ! রয় পারেনি !
খেলায় কি রয়ের মন নেই ?
রয়কে বড্ড অন্যমনস্ক ঠেকছে !
সেই মুহূর্তে, স্টেডিয়ামের বাইরে...
ঢুকে পড়ো ! খেলা সবে শুরু হয়েছে !
বলো রোভার্সের জয় ! সবাই একসঙ্গে বলো !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)
এরা কারা ?

দ্বাররক্ষী তখন সদাশিবকে শিবিরের মধ্যে নিয়ে আসে
এই ছোঁড়াটা ঝামেলা করছে হুজুর। বলছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।
কী ব্যাপার ?
ওকে একটু বাইরে যেতে বলুন না
তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া তো !
প্রহরীরা সরে গেলে...
কে তুই ? কোথা থেকে আসছিস ?
আমার নাম সদাশিব। আমি তোর্না দুর্গ থেকে আসছি। শিবাজি আমাকে পাঠিয়েছেন

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাশ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১	২			৩	৪	৫
৬			৭		৮	
		৯		১০		
	১১			১২		
১৩		১৪	১৫			১৬
১৭	১৮				১৯	
২০				২১		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) আতশবাজিবিশেষ। (৩) পঙ্গপাল। (৬) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যাকে দিশি বিস্কুট আখ্যা দিয়েছিলেন। (৮) মুকুট। (৯) গৃহহীন। (১১) পাহারা। (১২) সাধ। (১৪) দুমুখো দাওয়াই। (১৭) সুর। (১৯) আকাশ থেকে বৃষ্টি ছাড়া আর কী পড়ে? (২০) বুদ্ধির বাসস্থান। (২১) বিশ্বামিত্র।

উপর-নীচ : (১) ঘোরতর। (২) ডালের তৈরি। (৪) রাত্রিবেলায় সাপকে অনেকে কী বলে? (৫) ভক্তিমূলক গান। (৭) পাপ। (৯) বিচারপতি। (১০) গুটিপোকা বানায়, আমরা পরি। (১৩) জামায় থাকে। (১৫) সুদর্শন পায়রা। (১৬) গোলাকার বস্তু। (১৮) পর্বত। (১৯) দুমুখো আধার বা পাত্র।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ক	র্ণ		রা		ভী	ম
ম		শ	জা	রু		ধ্য
ঠ	ক		রা		গা	মা
	র		নী		লা	
চা	ম	চ		লা	গা	ম
কু	চা		কা		ল	হু
রি		চা	বু	ক		য়া

মজার খেলা

এ-খেলার জন্য চাই বারোটা দেশলাইকাঠি আর একজন বন্ধু। বন্ধু তো চাই-ই, নইলে কোনো খেলাতেই মজা পাওয়া যায় না।

প্রথমে তিনটে কাঠি দিয়ে নীচের ছবির মতন একটা ত্রিভুজ তৈরি করে বন্ধুকে দেখাও। তিনটে কাঠি দিয়ে তৈরি এই ত্রিভুজটা হল সমবাহু ত্রিভুজ, অর্থাৎ তিনটে বাহুই সমান। বন্ধুকে বুঝিয়ে দাও ব্যাপারটা।

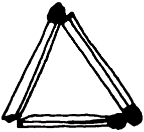

এবার তার হাতে বাকি ৯টা দেশলাইকাঠি তুলে দাও। তাকে যা করতে হবে তা হল, এই কাঠিগুলো সাজিয়ে ৬টা সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি।

বন্ধুর বুদ্ধি কী-রকম, প্রথমে তার পরীক্ষা হোক। বন্ধু যদি না পারে, তখন তোমার।

তুমি নিশ্চয়ই পেরে গেছ। যারা পারোনি, তাদের জন্যই শুধু নীচের সমাধানটা—

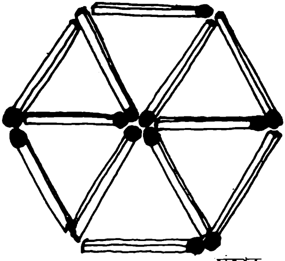

মজারু

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল টালির ফোটো
ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ লম্বা প্যান্টকে ইংরেজিতে বলে Trousers, কথাটা Singular না Plural ?
উঃ উপরের দিকটা Singular, নীচেরটা Plural.

প্রঃ কুকুর বিষয়ে তোমার আর তোমার ভাইয়ের রচনা যে একেবারে হুবহু এক, কে কারটা দেখে লিখেছে ?
উঃ দুজনে যে একই কুকুর দেখে লিখেছি স্যার।

প্রঃ মোটা মানুষরা বেশ অমায়িক হয়, কেন বলতে পারেন ?
উঃ অমায়িক না হয়ে যে উপায় নেই, ঝগড়াঝাটি মারামারি করলে তাড়া খেলে যে দৌড়ে পালাতে পারবে না।

সুসেন

হাসিখুশি

"বলো তো পাপান, চাঁদ আর সূর্য—এদের মধ্যে কোন্‌টি বেশি দরকারি ?"
"চাঁদ, স্যার।"
"কেন ?"
"সূর্য তো দিনের বেলা ওঠে, যখন আলোর দরকারই নেই। কিন্তু রাত্রে চাঁদ না থাকলে পৃথিবী কেমন অন্ধকারে থাকত ভাবুন তো!"

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামি বলল, "হুজুর, আমি যে দোষী, তা স্বীকার করছি।"
"কিন্তু সাতদিন ধরে তুমি নিজেকে নির্দোষ বলছিলে কেন ?"
"ধর্মাবতার, গোড়াতে মনে হয়েছিল আমার কোনো দোষ নেই, কিন্তু এখন উকিলবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে আমার মত পালটে গেছে।"

ছাত্রের বাবা স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের কাছে এসে অভিযোগ করলেন, "আপনি আর আমার ছেলেকে কলার জোড়া দু'পয়সা, দুধের কিলো চার আনা, টাকায় দুটো ইলিশ মাছ—ওইসব অঙ্ক কষতে দেবেন না। আমি কাল সারা রাত স্বপ্ন দেখেছি, এক টাকায় ব্যাগভর্তি বাজার করে বাড়ি ফিরছি।"

"আপনার কাছ থেকে যে লেবু কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে দুটো লেবু পচা। বিশ্বাস না হয়, বাড়ি থেকে এনে দেখাতে পারি।"
"না, না, এনে দেখাতে হবে না। আপনার মুখের কথাই তো ওই লেবু দুটোর সমান।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

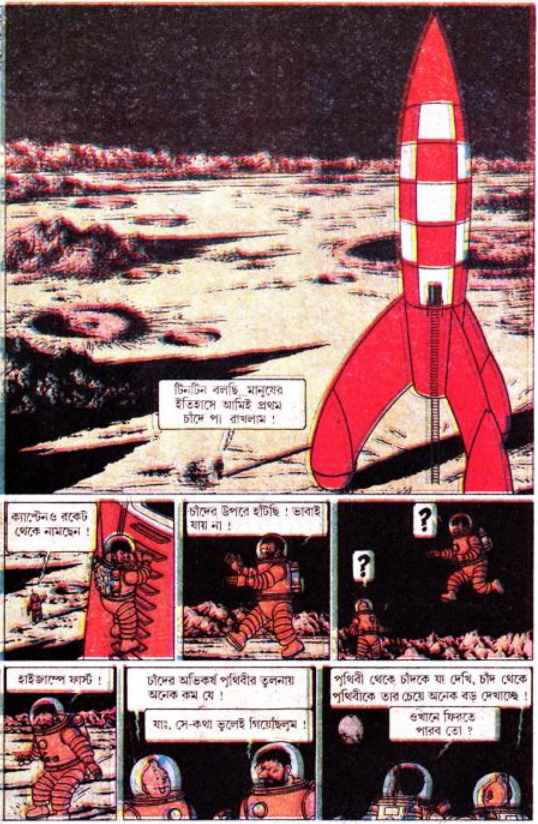
টিনটিন বলছি...মানুষের ইতিহাসে আমিই প্রথম চাঁদে পা রাখলাম !
ক্যাপ্টেনও রকেট থেকে নামছেন !
চাঁদের উপরে হাঁটছি ! ভাবাই যায় না !
?
?
হাইজাম্পে ফার্স্ট !
চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম যে !
যাঃ, সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলুম !
পৃথিবী থেকে চাঁদকে যা দেখি, চাঁদ থেকে পৃথিবীকে তার চেয়ে অনেক বড় দেখাচ্ছে !
ওখানে ফিরতে পারব তো ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ফ্যাশনে বিজয়ী বিক্রমের

® স্পোর্টসসার্ট · গেঞ্জি জাঙ্গিয়া

বিক্রম হোসিয়ারী

অফিস : ২৬ শিবতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭০

ফ্যাক্টরি : ৩০ এফ, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪

বরের বাবা
কিছুতেই
খাবেন না...

....কিন্তু কেন ?

জামাই বল্লেন "বাবা

আনন্দ

ছাড়া খান না!"

কথাটা ঠিকই—আনন্দ কেটারারের সুস্বাদু খাবার বিয়ে, অন্নপ্রাশন বা যে কোন উৎসবই হোক না কেন—যাঁরা একবার আস্বাদ পেয়েছেন তাঁদের কাছে আনন্দ কেটারারের পরিবেষিত খাবারই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। যে কোন স্বাদের—যে কোন জাতের উৎকৃষ্ট মানের খাবার — সুষ্ঠ পরিবেশনায়—

আনন্দর

জুড়ি মেলা ভার

আনন্দ ক্যাটারার এ্যাণ্ড কন্ট্রাক্টর

২০, বেথুন রো, কলিকাতা-৬, ফোন : ৫৫-৬৮৮৯, ৫৫-৩৯৬২

প্রথম বাস

বারিদবরণ ঘোষ

কলকাতায় প্রথম বাস আসার পরে দেড়শোটা বছর কখন যেন চুপি-চুপি পার হয়ে গেছে। আসলে আমরা ক'জনেই বা জানি—কবে কলকাতার বুকে প্রথম বাস চলেছিল। কেমনই বা ছিল তার চেহারা। সবাই ছুটছি উর্ধ্বশ্বাসে, অত সব নথিপত্র-দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে কবে বাস চলেছিল তার ইতিহাস বের করার সময় কোথায় আমাদের ?

অথচ ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে তখনকার কলকাতার ইংরেজি কাগজগুলোতে একটা অভিনব রকমের বিজ্ঞাপন পড়ে সবাই চমকে উঠেছিলেন। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা ছিল অনেকটা এই রকমের : অভিনব সংবাদ ! অভিনব সংবাদ !! কলিকাতায় খুব শীঘ্রই অমনিবাস আসিতেছে। কী ব্যাপার ? কী ব্যাপার ! অমনিবাস—সে আবার কী ? আমরা যা জানি তাতে অমনিবাস হল এক ধরনের রচনাবলী। এই ধরা যাক—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইগুলোকে একত্র করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে 'শরদিন্দু অম্‌নিবাস' নামে। তবে কি কলকাতায় নতুন কোনো বই প্রকাশিত হতে চলেছে ?

কিন্তু চোখ কচলে দেড়শো বছর আগেকার কলকাতার সংবাদপত্র-পড়ুয়া দেখলেন বিজ্ঞাপনে যেন আরও লেখা রয়েছে : এই অমনিবাস মালিকের বাড়ির কাছে ধর্মতলা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যারাকপুর পর্যন্ত যাইবে।

তাহলে তো কোনো পুস্তক নয়।

কদিন পর আবার বিজ্ঞাপনের বুলেট : যাঁহারা অমনিবাসের দৌড় পরীক্ষা দেখিতে

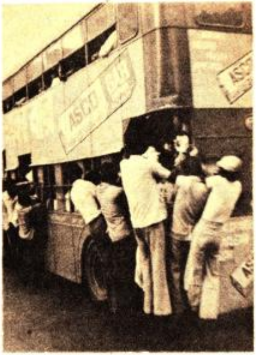

বাসের ভিড় কিন্তু কমেনি

চান তাঁহারা আগামী শুক্রবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে হাজির হউন।

অমনি সারা কলকাতায় সাজো-সাজো রব উঠল। চলো সবাই ঘোড়দৌড়ের মাঠে, চলো।

বিচক্ষণ মানুষেরা খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন—যে অমনিবাস আসছে সেটা কী বস্তু। তাঁরা জানতে পারলেন মাত্র আগের বছরের মাঝামাঝি সময়ে এই অমনিবাস ইংল্যাণ্ডে চালু হয়েছে। অবশ্য এ বাস তারা নিয়ে এসেছে ফ্রান্স থেকে। ইংল্যাণ্ডে এই অমনিবাস এমন চালু হয়ে গেছে যে, লণ্ডনের নিউ রোড তার চলাচলের আওয়াজে একদম সরগরম। এমন শস্তা আর আরামদায়ক যান পেয়ে সবাই অন্য যানের ভরসা ছেড়ে দিয়েছেন। কপাল মন্দ ব্রুহাম-ফিটন-ল্যাণ্ডোদের। বাধ্য হয়ে তারাও কমিয়ে দিয়েছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভাড়ার হার। তবুও ঐ অমনিবাসেই সবাই ভিড় করছে।

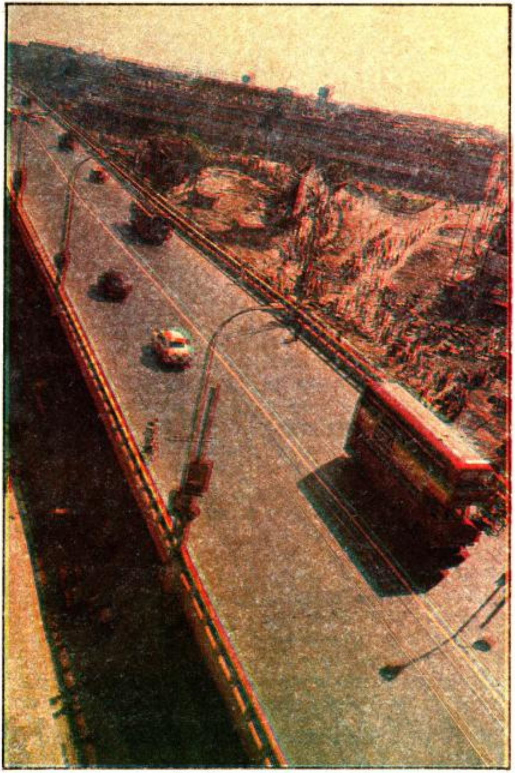

ফোটো : তপন দাশ

এখন আর জ্যাম হয় না. বাস ছুটেছে শিয়ালদহ ফ্লাই-ওভারের উপর দিয়ে

ফোটো : তপন দাস

ইস্টার্ন বাইপাস, উত্তর-দক্ষিণে দ্রুত যাতায়াতের নতুন সড়ক

দেখতে দেখতে বিজ্ঞাপনের শুক্রবার এসে গেল। নভেম্বরের ঠাণ্ডা আমেজে কলকাতার রাস্তায় নামল রথযাত্রার ভিড়। তখন তো আর ফুটপাথ বলে কিছু ছিল না। গো-গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ির দাপটে পথ চলাই দায় ছিল। তা সেদিন সেসব দাপট থামিয়ে দিয়ে কাতারে-কাতারে কলকাতার মানুষ ছুটল ঘোড়দৌড়ের মাঠের পানে।

দু-একদিন হল ইংল্যাণ্ড থেকে আনা হয়েছে এই অভিনব অমনিবাস। সবাই দু-চোখ ভরে দেখতে লাগল এই অপরূপ যানটিকে; ঠিক যেন ঠাকুর-দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। দু-একজন গড় হয়ে পেন্নাম পর্যন্ত ঠুকে বসল। তারপর যখন অমনিবাসটা হেলে-দুলে দৌড় শুরু করল—অমনি চারিদিকে হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ হয়ে গেল। পুরো গোটা-তিনেক চক্কর মেরে বাসটা এসে থেমে গেল।

তারপর ঐ ১৮৩০-এর নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে যাত্রী বোঝাই করে ধর্মতলা থেকে ব্যারাকপুরের দিকে প্রথম রওনা হল কলকাতার অমনিবাস। কলকাতার রাস্তায় আধুনিক পরিবহণের সেই প্রথম সূত্রপাত। ট্রামের জন্যে তো আমাদের আরও পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

কেমন ছিল বাসটা দেখতে?

যে অমনিবাস কলকাতার বুকে প্রথম এল, তা আদৌ যন্ত্রের সাহায্যে চলেনি। তিনটে ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যেত সেই বাস তার নির্দিষ্ট গতিপথের দিকে। তার চাকা অবিশ্যি রবারের তৈরি ছিল—তাই ঘরঘর আওয়াজ উঠত না। কিন্তু তিনটে ঘোড়ার বারোটা খুরের শব্দে নিশ্চয়ই কলকাতার সেদিনের পথ দারুণ সরগরম হয়ে উঠেছিল।

এখন বোঝা গেল 'বাস' শব্দটি ঐ 'অমনিবাস' থেকেই এসেছে— যার অর্থ যাত্রীবহনকারী শকট! শর্টকাটের যুগ তো!

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

'বলে গেছেন রাম শন্না'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেদিন কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘর-সদৃশ ড্রয়িংরুমে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেলুম। বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বেজায় গম্ভীরমুখে কোনার দিকে বসে আছেন এবং ভুরু কুঁচকে জানালার বাইরে কার উদ্দেশে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। ওঁর ঋষিতুল্য সাদা দাড়িতে একটা কালো চকরাবকরা প্রজাপতি নিশ্চুপ বসে আছে, নিশ্চয় ওঁর সংগ্রহশালার কোনো দুর্লভ প্রজাতি। কিন্তু কর্নেলের এ-ব্যাপারে কোনো দৃকপাত নেই।

ওই জানালার বাইরে এক বিশাল নিমগাছ। সেখানে ঝাঁকেঝাঁকে শীতের কুচকুচে কালো কাক তুমুল চেঁচামেচি করছে। সেটাই কি আমার বৃদ্ধ বন্ধুর বিরক্তির কারণ ? উনি কি ওদের শাপমন্যি করছেন ? করারই কথা। ওই কদাকার পাখিগুলো ছাদের যত্নলালিত 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ডে' দুষ্প্রাপ্য অর্কিড এবং ক্যাকটাসের ওপর প্রায়ই হামলা করে।

"গুড মর্নিং" সম্ভাষণের জবাব না পেয়ে একটু ইতস্তত করার পর সোফায় বসে পড়লুম। একটু পরে ষষ্ঠীচরণ নিঃশব্দে কফির পেয়ালা রেখে গেল। তার মুখখানাও বেশ তুম্বো। অনুমান করলুম,

ভাল থাকার
আরামে নির্ভর

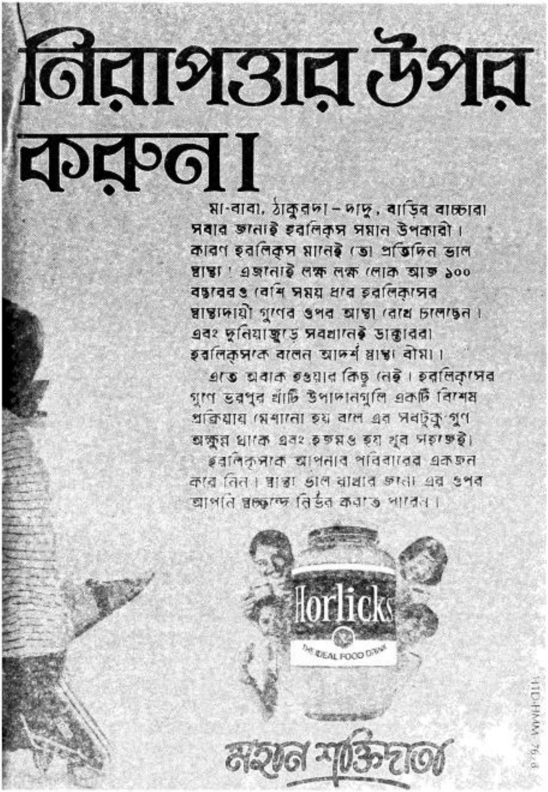
নিরাপত্তার উপর
করুন।
মা-বাবা, ঠাকুরদা – দাদু, বাড়ির বাচ্চারা সবার জন্যই হরলিক্স সমান উপকারী। কারণ হরলিক্স মানেই তো প্রতিদিন ভাল স্বাস্থ্য! এজন্যই লক্ষ লক্ষ লোক আজ ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হরলিক্সের স্বাস্থ্যদায়ী গুণের ওপর আস্থা রেখে চলেছেন। এবং দুনিয়াজুড়ে সবখানেই ডাক্তাররা হরলিক্সকে বলেন আদর্শ স্বাস্থ্য বীমা।
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। হরলিক্সের গুণে ভরপুর খাঁটি উপাদানগুলি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় মেশানো হয় বলে এর সবটুকু গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং হজমও হয় খুব সহজেই।
হরলিক্সকে আপনার পরিবারের একজন করে নিন। স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য এর ওপর আপনি স্বচ্ছন্দে নির্ভর করতে পারেন।
Horlicks
THE IDEAL FOOD DRINK
মহান শক্তিদাতা

তাহলে নির্ঘাত এই সুন্দর শীতের সকালে প্রভু-ভৃত্যে কোনো মনকষাকষি হয়ে থাকবে এবং প্রভু-ভদ্রলোক পেয়ারের ভৃত্যের উদ্দেশেই গোপনে শাপান্ত করছেন।

কিন্তু কী করে থাকতে পারে ষষ্ঠীচরণ ? কোনো প্রজাপতির ঠ্যাং ভেঙে ফেলেছে ? নাকি টোরা দ্বীপ থেকে সংগৃহীত তিনপেয়ে অলক্ষুনে বাদুড়টির খাঁচা খুলে দিয়েছে ? যতদূর জানি, ষষ্ঠী ওই কিম্ভূত স্তন্যপায়ী উড়ুক্কু জন্তুটিকে দুচক্ষে দেখতে পারে না।

কফিতে চুমুক দিয়ে আড়চোখে দেখলুম কর্নেল এবার টেবিলের দিকে ঝুঁকে কী যেন লিখছেন। মিনিট দুই পরে উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং পায়চারির ভঙ্গিতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তখন বললুম, "ষষ্ঠীচরণটা বড্ড বাজে।"

আমার বৃদ্ধ বন্ধু গলার ভেতর বললেন, "ষষ্ঠীর চেয়ে বাজে লোক জগমোহন বোস।"

"জগমোহন আবার কে ?"

কর্নেল একটা ভারী শ্বাস ছেড়ে বললেন, "আসলে লোকটা প্রচণ্ড অর্থপিশাচ। দেখো জয়ন্ত,টাকার চেয়ে দামি জিনিস হল মুখের কথা। কথা দিয়ে যে কথা রাখে না তার মতো পাপী আর কে ?"

"ঠিক, ঠিক। কিন্তু কী কথা দিয়ে কথা রাখেনি আপনার এই জগমোহন ?"

দুঃখিত স্বরে কর্নেল বললেন, "আগেও লোকটা ঠিক এরকম করেছিল। এম্মানুয়েল দ্য সামসার লেখা 'দা ফ্লোরা অ্যাণ্ড ফনা অব ক্রিসো আইল্যাণ্ডস' বইটার দরদাম ঠিক করে এলুম। পরদিন আনতে গিয়ে শুনি, বেশি দাম পেয়ে কাকে বেচে দিয়েছে। ১৭৮৪ সালের বই। অতি দুষ্প্রাপ্য। আমার ক্ষোভের কারণ শুধু তাই নয়, জগমোহন দাঁত বের করে হাসছিল। ভাবতে পারো ?"

সহানুভূতি দেখিয়ে বললুম, "ভীষণ অন্যায়।"

ফোঁস করে ফের শ্বাস ছেড়ে কর্নেল বললেন, "তুমি কি এই প্রবাদ শুনেছ ডার্লিং ? 'যত হাসি তত কান্না/বলে গেছেন রামশন্না।'"

"শুনেছি। সত্যি তো হাসি ভাল নয়। জগমোহন কেঁদে কুল পাবে না পরে।"

কর্নেল বললেন, "রাম শন্না অর্থাৎ রামশংকর শর্মা ১৮৫৯ সালে 'আত্মচরিত' নামে নিজের জীবনী লেখেন। খুব রোমাঞ্চকর তাঁর জীবন। কম বয়সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে সি-বয়ের চাকরিতে ঢোকেন। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। বৃদ্ধ বয়সে নদীয়ার গ্রামে ফিরে পৈতৃক ভিটেতে প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরি করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহিবিদ্রোহ হয়। রামশংকর গোপনে বিদ্রোহীদের অর্থসাহায্য করতেন। তার ফলে ইংরেজ শাসকদের কোপে পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসিসেলে থাকার সময় তিনি ওই আত্মচরিতখানি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সরকারের অনুমতি নিয়ে তাঁর ভাই শ্যামশংকর বইটি ছেপে বের করেন। বইটি সত্যি মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। জগমোহনকে কিছুদিন যাবত তাগিদ দিচ্ছিলুম, বইটি যদি যোগাড় করতে পারে।"

বাধা দিয়ে বললুম, "জগমোহনের কি বইয়ের দোকান আছে ?"

"হুঁ। কলেজ স্ট্রিটে গেলে দেখতে পাবে, সাইনবোর্ডে লেখা আছে : 'হারানো বই'। ঘুপচি ঘরের ভেতর আগাপাশতলা পুরনো বইতে ঠাসা। দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। ফুটপাথ থেকে কথা বলতে হবে। তবে জগমোহনকে তুমি পুরোপুরি দেখতে পাবে না। বইয়ের গাদার ফাঁকে ওর নাকটুকু ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না। শরীরের বাকি অংশ দেখতে হলে তোমাকে টাকা বের করতে হবে। তখন দেখবে বইয়ের সুড়ঙ্গ থেকে ফ্যাকাশে একটা হাতের তালু বেরিয়ে আসছে।"

কর্নেল করুণ হাসলেন। ফের বললেন, "গতকাল সন্ধ্যায় সে ফোনে বলল, শিগগির চলে আসুন। বইটা পাওয়া গেছে। কিন্তু এদিকে হতচ্ছাড়া ষষ্ঠী এমন কীর্তি করে বসে আছে যে তখন আমার মরবারও ফুরসত নেই। পাগল হয়ে খুঁজছি।"

"কী?"

"বৈজ্ঞানিক নাম হল ভ্যানেসা আর্টিসি। বাংলায় বলতে পারো কাছিম-প্রজাপতি। কারণ দূর থেকে দেখলে মনে হবে লিলিপুট কাছিম। উড়লেই কিন্তু ঝলমলে পরী। আমার বিশ্বাস, নচ্ছার ষষ্ঠী ওটাকে ওড়াতে চেয়েছিল। অমনি হাত ফশকে পালিয়েছে। ওঃ জয়ন্ত! কী কষ্ট করে না ওটা যোগাড় করে এনেছিলুম। তুমি জানো, এই শীতে ওদের ঘুমোবার সময়? বেচারাকে ঘুম থেকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে ব্যাটাচ্ছেলে ষষ্ঠীচরণ..."

ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "রাম শন্নার বইটা আর পাবেন কি না জানি না, তবে আপনার প্রজাপতিটা আপনি পাবেন—যদি স্থির হয়ে একটু দাঁড়ান।"

ওঁকে ভীষণ চমকে দিয়ে ওঁর দাড়ি থেকে খপ্ করে প্রজাপতিটা ধরে ফেললুম। কর্নেল বিস্ময় ও আনন্দে এক চিক্কুর ছেড়ে আমার হাত থেকে প্রিয় প্রজাপতিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে দৌড়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ডার্লিং! এবেলা তোমার লাঞ্চে নেমন্তন্ন।"

কিছুক্ষণ বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ যেন শিশু হয়ে গেলেন। ষষ্ঠীচরণকে ক্ষমা করে দিলেন। মুখ টিপে হেসে সে ঝটপট ফের দুপেয়ালা কফি এবং প্লেটভর্তি স্ন্যাক্স রেখে গেল।

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ—জগমোহনের আচরণে সত্যি দুঃখ পেয়েছি, জয়ন্ত। কাল রাত নটায় দোকান বন্ধ করার সময় ফোন করে বলেছে, আমি যাইনি বলে অন্য এক জন খদ্দেরকে বইটা বেচে দিয়েছে। দেখ ওর কাণ্ড। সন্ধ্যা সাতটায় বইটা পেয়েছে বলে খবর দিল। তার দু'ঘন্টা পরে জানাল, অন্য একজনকে বেচে দিয়েছে। আবার সেই সঙ্গে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসি।"

"কী আছে বইটাতে যে, এত আফসোস হচ্ছে আপনার?"

কর্নেল হঠাৎ কোনার সেই টেবিলটার দিকে উঠে গেলেন। তারপর একটুকরো কাগজ হাতে নিয়ে ফিরলেন। কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটুখানি বিড়বিড় করার পর বললেন, "আচ্ছা জয়ন্ত, এমন পাঁচটা পাখির নাম করো তো, যা ক অক্ষর দিয়ে শুরু।"

ভেবে নিয়ে বললুম, "কাক, কোকিল, কাঠঠোকরা, কাকাতুয়া, কাদাখোঁচা..."

"খাসা জয়ন্ত, খাসা! দিশি মতে ক অক্ষর খুব পয়মন্ত। ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর। হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণের নাম এই অক্ষর দিয়ে শুরু। ভক্ত প্রহ্লাদের গল্পে আছে, পাঠশালায় বালক প্রহ্লাদ ক পড়তে গিয়ে কেঁদে ফেলত। তো জয়ন্ত, তুমি যে পঞ্চপাখির নাম বললে, প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপিতে তারা ছিল পাঁচটি পবিত্র শব্দের প্রতীক। স্যাটর, আরেপো, টেনেট, অপেরা, রোটাস। মিশরে রোমানদের রাজত্বকালে এই শব্দগুলো দিয়ে এক আশ্চর্য ধাঁধা বানানো হয়েছিল। এই দেখো।"

তাহলে তখন আমার বিজ্ঞ বন্ধু কাগজে এই ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কাগজটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। তাতে লেখা আছে:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

চুপ করে আছি দেখে কর্নেল বললেন, "কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে না?"

"হ্যাঁ। যে দিক থেকে যে অক্ষর ধরে পড়ি, পাঁচটা একই শব্দ পাচ্ছি। মিশরীয়রা মাথা খাটিয়ে অদ্ভুত সাজিয়েছে তো!"

"শুধু তাই নয়। ছকটা চারদিকে SATOR শব্দ দিয়ে ঘেরা। রোমানরা একে বলত Cirencester Word Square এবং এ নাকি এক রহস্যময় শব্দবর্গ। সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে প্যাপিরাসে মিশরীয় চিত্রলিপিতে এই শব্দবর্গ লেখা হয়। উনিশ শতকে এটি উদ্ধার করা হয়। হিড়িক পড়ে যায় এই ধাঁধার জট ছাড়াতে। আপাতদৃষ্টে রোমান ভাষায় শব্দগুলো পরপর রেখে মানে করলে দাঁড়ায়: The Sower Arepo holds the wheels carefully. অর্থাৎ সোজা কথায়: 'আরেপো নামে একটা লোক শস্যের বীজ ছড়ানোর সময় বীজছড়ানো যন্ত্রের চাকাগুলো সাবধানে ধরে থাকে।' কিন্তু এ কথায় কী বলতে চাওয়া হয়েছে? নানাজনে নানা মানে বের করলেন। তারপর ১৮৪৭ সালে এক ইংরেজ অভিযাত্রী আফ্রিকা অভিযানে গিয়ে ইথিওপিয়ার এক প্রাচীন দুর্গে আবিষ্কার করলেন একটা অদ্ভুত জিনিস। সিন্দুকের ভেতর পাঁচটা চামড়ার মোড়ক। মোড়কের ভেতর একটা করে প্রকাণ্ড পেরেক। আর মোড়কগুলোর গায়ে রোমান হরফে লেখা আছে SATOR AREPO, TENET, OPERA, ROTAS! প্রতিটি পেরেকে নাকি রক্তের দাগ এবং রোমান ভাষায় কিছু খোদাই করা বাক্য। ইউরোপে আরও হৈ-চৈ পড়ে গেল। পণ্ডিতরা একবাক্যে রায় দিলেন, তাহলে এই হচ্ছে সেই পাঁচটা পেরেক, যা বিঁধিয়ে যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ভ্যাটিকানে যিশুর পবিত্র রক্তমাখা পেরেকগুলো রাখার আয়োজন হল। বিশেষ জাহাজ গেল সেই উদ্দেশে। কিন্তু ফেরার পথে ভূমধ্যসাগরে জাহাজটা ডুবে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগে। ব্যস,

সেখানেই এই ঘটনার শেষ।"

বললুম, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে শব্দগুলো পাঁচটা পেরেকের নাম। কিন্তু এতকাল পরে ওগুলো আপনার মগজে বিঁধিয়ে দিল কে?"

"রামশংকর শর্মা ওরফে রাম শন্না।"

"সে কী!"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "গতকাল ভৈরবগড় রাজবাড়িতে ওঁদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে বইটা দেখি। ২০৪ পৃষ্ঠার বই। খুব জীর্ণ অবস্থা। একরাতেই পড়ে শেষ করি। এক অসাধারণ বাঙালি অ্যাডভেঞ্চারিস্টের আশ্চর্য কীর্তিকলাপ! কিন্তু এক জায়গায় রামশংকর লিখেছেন : ত্রিনিদাদের গ্রামে বাস করার সময় ঝড়জলের রাতে একজন রুগ্ণ স্প্যানিশ পাদ্রি তাঁর ঘরে আশ্রয় নেন। শেষরাতে তিনি মারা যান। তাঁর আলখেল্লার মধ্যে চামড়ার একটা মোড়ক ছিল। স্থানীয় গির্জায় পাদ্রির জিনিসপত্র পৌঁছে দেবার আগে কৌতূহলবশে রামশংকর মোড়কটা খোলেন। তার ভেতর ফুটখানেক লম্বা কালো মোটা একটা লোহার পেরেক ছিল, তার গায়ে রোমান হরফে কীসব লেখা ছিল। পেরেকটাতে একটুও মরচে ধরেনি এবং আশ্চর্য ব্যাপার, তাতে রক্তের দাগ ছিল। চামড়ার মোড়কেও রোমান হরফে লেখা ছিল SATOR, কী ভেবে ওটা রামশংকর ফেরত দেননি। পরে এক বিশপের কাছে কথাটার মানে জিজ্ঞেস করে রহস্যটা টের পান। তাহলে জাহাজডুবির সময় অন্তত একটা পেরেক কেউ বাঁচাতে পেরেছিল—হয়তো সেই রুগ্ণ পাদ্রিই।"

জিজ্ঞেস করলুম, "রাম শন্না কী করলেন পেরেকটা?"

"সেটাই প্রশ্ন। আত্মচরিতে কোথাও সেকথা লেখা নেই। এমন কী, পরে ওটার উল্লেখ পর্যন্ত নেই।" কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে বললেন, "বইটা

রাজাবাহাদুরকে উপহার দিয়েছেন রামশংকরেরই এক বংশধর প্রণবশংকর বাঁড়ুজ্যে। খুব দুষ্প্রাপ্য বই। সঙ্গে মাইক্রোফিল্মের সরঞ্জাম ছিল না। ভাবলুম সময়মতো এসে মাইক্রোফিল্ম কপি করে নেব। তো আমার বরাত। কদিন আগে রাজাবাহাদুর ট্রাংককলে জানালেন, বইটা চুরি গেছে। তাঁর সন্দেহ, রাজবাড়ির আশ্রিত এক ভদ্রলোকের জুয়াড়ি নেশাখোর ছেলে হরিসাধনই একাজ করেছে। কারণ ইতিপূর্বে তাঁর লাইব্রেরি থেকে কিছু দুষ্প্রাপ্য বই চুরি গেছে।"

"তাই আপনি কলেজ স্ট্রিটে জগমোহনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন?"

"তা তো বটেই! বইটা ফেরত পেলে রাজাবাহাদুর খুশি হতেন, আমারও মাইক্রোফিল্ম কপি হয়ে যেত।"

"এবং পেরেক-উদ্ধারে অবতীর্ণ হতেন!"

আমার মন্তব্য শুনে গোয়েন্দাপ্রবর একটু হাসলেন। "ব্যাপারটা বোধ করি অত সহজ নয়, ডার্লিং! তবে আত্মচরিতের পরিশিষ্ট অংশটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, কথাগুলোর মধ্যে কী যেন ইঙ্গিত আছে। তো..."

ষষ্ঠীচরণ এসে বলল, "এক ভদ্রলোক এয়েছেন বাবামশাই! খুব যেন হাঁফাচ্ছেন। চোখ-মুখ লাল হয়ে রয়েছেন।"

কিন্তু ভদ্রলোক অনুমতির অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে আমার পাশে ধপাস করে বসে পড়লেন। ষষ্ঠীচরণ কড়া চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোকের গড়ন নাদুসনুদুস। পরনে দামি স্যুট। হাতে ব্রিফকেস। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুরু কাঁচাপাকা গোঁফ আর মাথায় অল্প টাক আছে। রুমালে মুখ ঘষে বললেন, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার! দুলক্ষ টাকার মাল সাপ্লাইয়ের অর্ডার বাতিল হতে চলেছে! আমায় বাঁচান!"

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে লক্ষ করছিলেন ভদ্রলোককে। বললেন, "কে আপনি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম রামদুলাল সিনহা। আরবমুলুকে ইলেকট্রনিক গুডস রফতানির কারবার আছে। স্যার, পার্ক স্ট্রিটে আমার সিনহা ট্রেডিং কোম্পানির পাশের চেম্বারে আপনি যাতায়াত করেন।..."

"হুঁ, ডক্টর বৈদ্য আমার বন্ধু।"

"তিনিই পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে আসতে।"

"কিন্তু সাপ্লাই অর্ডার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?"

"না স্যার, না স্যার! সেজন্য আসিনি। একখানা বই চুরি গেছে।"

ভুরু কুঁচকে তাকালেন গোয়েন্দাপ্রবর। "বই? কী বই?"

"এক মিনিট স্যার! বলছি।" রামদুলালবাবু ব্রিফকেস খুলে একটুকরো কাগজ বের করলেন। কর্নেলের হাতে দিয়ে বললেন, "এই দেখুন বইটার নাম-টাম সব লেখা আছে। কলেজ স্ট্রিটের জগমোহন বোস আমার সম্পর্কে বেয়াই হন। তাঁকে বলে রেখেছিলুম বইটার জন্য। কাল সন্ধ্যাবেলা উনি ফোন করলেন, বইটা পাওয়া গেছে। পাঁচশো টাকার এক পয়সা কমে হবে না। পার্টি দাঁড়িয়ে আছে বই নিয়ে। দু লাখ টাকার ডিল স্যার! দৌড়ে গেলুম টাকা নিয়ে।"

"দাঁড়ান! এই হাতের লেখা কার?"

"যাঁকে প্রেজেন্ট করতুম, তাঁর স্যার। ওনার মাধ্যমেই তো অর্ডারটা পেয়েছি স্যার!"

"ইংরেজিতে লেখা কেন?"

"উনি যে বাংলা জানেন না স্যার!"

"কী নাম?"

"এক রোডরিগ্। গোয়ার লোক স্যার! থাকেন বোম্বেতে।"

"উনি বাংলা বই কী করবেন?"

রামদুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "তা

তো জানি না স্যার ! কদিন আগে বোম্বে গেলুম, তখন এই কাগজে লিখে দিয়ে বললেন, বইটা যোগাড় করে দিলে দুলাখ টাকার অর্ডার পাইয়ে দেবেন।"

"বেশ। এবার বলুন, বইটা কীভাবে চুরি গেল ?"

রামদুলালবাবু বললেন, "এক গ্লাস জল খাব স্যার।"

ষষ্ঠীচরণ ভেতরের পর্দা তুলে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। কর্নেল বলার আগেই জল দিয়ে গেল। রামদুলালবাবু জলটা ঢকঢক করে খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বললেন, "বইটা অফিসেই টেবিলের ড্রয়ারে রেখে বাড়ি গিয়েছিলুম। অফিসে কিছু কাজ ছিল। সারতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। আজ সওয়া বারোটার ফ্লাইটে বোম্বে যেতুম বইটা সঙ্গে নিয়ে। অফিসের কিছু কাগজপত্রও নেওয়ার দরকার ছিল। তাছাড়া থাকি সেই বেহালায়। ভেবেছিলুম, যাবার পথে অফিস হয়ে সর্ব নিয়ে যাব। তো অফিসে এসে দেখি, বইটা নেই। তন্নতন্ন খুঁজে অফিসের সব্বাইকে জিজ্ঞেস করে কোনো হদিস পেলুম না।"

"ড্রয়ারে তালা দেওয়া ছিল ?"

"ঠিক খেয়াল হচ্ছে না স্যার ! এসে দেখলুম তালা দেওয়া নেই। ড্রয়ারের তালা কিন্তু ভাঙা নেই।"

"চাবি আপনার কাছে থাকে তো ?"

"হ্যাঁ স্যার ! তবে অফিসের চাবি দারোয়ানের কাছে থাকে। কিন্তু দারোয়ান কেন বই চুরি করবে ?"

"অফিসে রাতে দারোয়ান ছাড়া আর কে থাকে ?"

রামদুলালবাবু চমকে উঠলেন। "আর কেউ থাকে না। তবে গত রাতে...স্যার ! তাহলে কি সেই লোকটাই ?"

"কোন্ লোকটা ?"

"রোডরিগ সায়েবের রিপ্রেজেন্টেটিভ। কাল বিকেলে বোম্বে থেকে ভদ্রলোক এসেছিলেন। কার্ড দেখালেন। বললেন, রাত্তিরটা থেকে গৌহাটি যাবেন ভোরের ফ্লাইটে। আমি বললুম, তাহলে কষ্ট করে হোটেলে গিয়ে লাভ কী ? অফিসে দুখানা ঘর—মাঝখানে পার্টিশান। ওঁকে পাশের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। সকালে অফিসে এসে দরোয়ানের কাছে জিগ্যেস করলুম। বলল, ভদ্রলোক ভোরে চলে গেছেন।"

"কী নাম ?"

একটু ভেবে নিয়ে রামদুলালবাবু বললেন, "কী যেন—আর মৈত্র, নাকি এস মৈত্র। তবে স্যার, অবিশ্বাস করব কেমন করে ? রোডরিগ সায়েবের কত রিপ্রেজেনটেটিভ তো মাঝে মাঝে কলকাতা আসে। আমার অফিসে রাত কাটিয়ে যায়।"

"কেমন চেহারা ?"

"ছিপছিপে গড়ন। ফর্সা রঙ। মুখে দাড়ি।"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে। আপনি এখন আসুন। আমি দেখছি।"

রামদুলালবাবু কর্নেলের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমার সাংঘাতিক ক্ষতি হবে স্যার, বইটা না পেলে। বেয়াই বলেছে ও বই মাথা ভাঙলেও আর পাওয়া যাবে না কোথাও। মাত্র ওই একটা কপি ছিল। তাছাড়া, আমি আবার বেয়াইয়ের দোকানে গিয়েছিলুম স্যার। সেখান থেকেই আসছি। জগমোহন বোস একই কথা বলল।"

আরও কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে রামদুলালবাবু বিদায় নিলেন। কর্নেল গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। বললুম, "জগমোহন এর পেছনে নেই তো ? হয়তো বইটার আরও শাঁসালো খদ্দের জুটে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "অনেক ক্ষেত্রে জগমোহন বইচোরের সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারটা ভারী

অদ্ভুত তো! রোডরিগ নামে একটা লোকের এ বই কেন দরকার হল! জয়ন্ত, সময় আছে তোমার?"

"আজ আমার অফ-ডে। কেন?"

"চলো তো একবার কলেজ স্ট্রিট ঘুরে আসি।"

॥ দুই ॥

কলেজ স্ট্রিট-মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। লোকে লোকারণ্য। আমার গাড়ি আটকে গেল জটে। মিছিল কিংবা পথসভা নাকি? এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলুম, "কী ব্যাপার দাদা?"

দাদা-ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, "আর বলবেন না মশাই! দিনে দিনে এ হচ্ছেটা কী? প্রকাশ্য দিবালোকে একগাদা লোকের চোখের সামনে খুনখারাপি! উঃ! আমার মাথাটা কেমন করছে। স্ট্রোক না হলে বাঁচি।"

আরেক পথচারী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে খুন হল? কোথায় খুন হল?"

"ওই যে, দেখুন গে না স্বচক্ষে। একটা মুখোশপরা লোক বইয়ের দোকানদারকে গুলি করে পালিয়েছে।"

পাশে দাঁড়িয়ে পেন বেচছিল এক হকার। সে মন্তব্য করল, "জগাইদাটা মরবে আমি জানতুম। কার বই চুরি করে কাকে বেচত। দেখেশুনে ওর দোকানের সেলসম্যানগিরি ছেড়ে রাস্তায় নেমেছি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

কর্নেল গাড়ি থেকে মুখ বের করে দেখে বললেন, "জগাইদা মানে জগমোহন মনে হচ্ছে, জয়ন্ত! ওর দোকানের সামনেই ভিড়টা বেশি দেখছি। তুমি গাড়িটা কাছাকাছি রেখে অপেক্ষা করো। আসছি।"

এতক্ষণে আমার পিলে চমকাল। বললুম, "সর্বনাশ! জগমোহন খুন হয়ে গেল তাহলে?"

কর্নেল নির্বিকার মুখে বেরিয়ে গেলেন। পেনওয়ালা হকার আমার কথাটা শুনতে পেয়েছিল। বলল, "হ্যাঁ স্যার! নাকি জিপগাড়ি চেপে একটা লোক এসেছিল। এসেই ঢিস্যুম্ ঢিস্যুম্ করে দুই গুলি!"

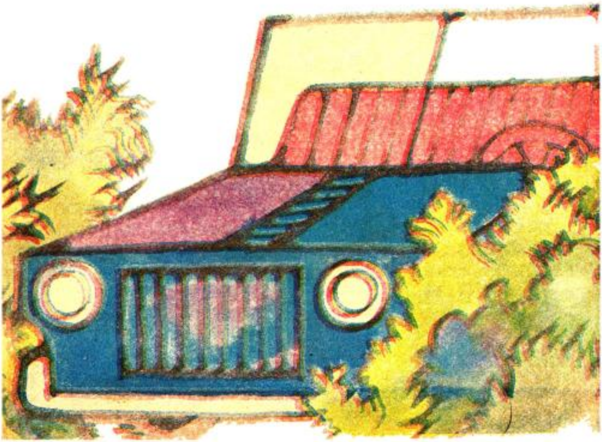

লোকটা আমার দিকে তাক করছিল কয়েকটা কলম নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ ট্রাফিকজট খুলতে শুরু করল। হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা হতে থাকল। বাঁপাশে খালি পেয়ে একটু এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করালুম। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকলুম।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, গোয়েন্দাপ্রবর আসছেন। এসে হাসতে হাসতে বললেন, "চলো! ফেরা যাক্!"

উনি গাড়ির ভেতর ঢুকে আরাম করে বসলে বললুম, "হাসছেন যে? বডি দেখলেন—নাকি নিয়ে গেছে হাসপাতালে?"

"কার বডির কথা বলছ ডার্লিং? জগমোহনের?"

"হ্যাঁ। আবার কার?"

"লোকটা অসম্ভব ধূর্ত।" কর্নেল চুরুট ধরালেন। গাড়ি মোড় ঘুরে এবার মহাত্মা গান্ধী রোডে পৌঁছেছে। কর্নেল বললেন, "তবে একথা সত্যি যে একটা মুখোশধারী লোক এসে ওর দোকানে হানা দিয়েছিল। তারপর ফট্‌ফট্ আওয়াজও শোনা গেছে। কিন্তু জগমোহন বহালতবিয়তেই আছে।"

আশ্বস্ত হয়ে বললুম, "তাহলে খুব জোর বেঁচে গেছে বেচারা।"

"খুব ভয় পেয়ে গেছে জগমোহন।" কর্নেল হাসতে থাকলেন। "আমাকে দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বলল, ভাগ্যিস বইয়ের আড়ালে ছিল সে, নইলে রক্তারক্তি হয়ে পড়ে থাকত।"

"কিন্তু এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! প্রথম চোটে গুলি ফশকেছে বলে বারবার ফশকাবে না।"

কর্নেল কোনো কথা বললেন না। চোখ বুজে সিটে হেলান দিয়ে মৃদু-মৃদু টান দিতে থাকলেন চুরুটে। সেইসঙ্গে একটা-একটা করে ওপড়ানোর ভঙ্গিতে দাড়ি টানতে থাকলেন। বরাবর দেখেছি, রহস্যের গোলকধাঁধায় ঢুকে যখন বেরুবার পথ পান না, তখন এমন দাড়ি ছেঁড়ার তাল করেন।...

ওঁর ফ্ল্যাটে আমার আজ লাঞ্চের নেমন্তন্ন। ষষ্ঠীচরণ আয়োজন করেছিল প্রচুর। ঘুঘুমশাই সেই যে চুপ করেছেন তো

করেছেন। কথাবার্তা বিশেষ বলছিলেন না। খাওয়ার পর ছাদে চলে গেলেন ওঁর 'প্ল্যান্ট্ ওয়ার্ডে'। আমার ভাত-ঘুমের অভ্যাস প্রবল। সোফায় হেলান দিয়ে চমৎকার একটা ভাত-ঘুম হয়ে গেল। শীতের বেলা কখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। চোখ মেলে দেখি, ঋষিসুলভ চেহারা নিয়ে এবং প্রসারিত হাতে কফির পেয়ালা নিয়ে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। সস্নেহে বললেন, "নাও ডার্লিং! জড়তা ঘুচিয়ে দিতে কফির তুল্য পানীয় আর নেই। আর শোনো, ও-ঘরে জগমোহন এসে বসে আছেন। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ওকে। এবার ডাকা যেতে পারে।"

ষষ্ঠী জগমোহনকে ডেকে আনল কর্নেলের নির্দেশে। সেইসঙ্গে তাকেও কফি দিয়ে গেল। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিলুম, কী অবস্থা হয়েছে মনের। যেন ব্লটিংপেপারে আঁকা স্কেচ। মোটাসোটা নাদুসনুদুস গড়নের মানুষ। মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল। চশমা নাকের ডগায় আটকে আছে কোনোরকমে। কপালে একটা টাটকা সিঁদুরের ফোঁটা—সম্ভবত কালীঘাটে দৌড়েছিলেন পুজো দিতে। সেখান থেকেই হয়তো আসছেন। কফির দিকে তাকিয়ে খাবেন কি না ঠিক করতে পারলেন না কয়েক সেকেণ্ড। শেষে সিদ্ধান্ত করলেন খাবেন এবং এক চুমুকে পেয়ালা অর্ধেক শুষে বললেন, "আমি গেছি। এক্কেরে গেছি!"

কর্নেল চোখ পাকিয়ে বললেন, "আপনি যাবেন না তো আর কে যাবে?"

জগমোহন হাত নেড়ে আর্তনাদ করলেন, "আর কখনো এমন হইব না স্যার! যদি হয়, আমার কানদুটো কাইট্যা কুত্তার গলায় লটকাইয়া দিয়েন!"

কর্নেল ধমক দিলেন ; "তাহলে বুঝতে পারছেন, কিসের গর্তে হাত ভরেছিলেন?"

"পারছি না স্যার? খুব পারছি।" জগমোহন করুণ করে বললেন। "আপনের কাছে মিথ্যা কওনের সাধ্যি নাই। হ, বইখান ভৈরবগড় রাজবাড়ির। ওই পোড়াকপাল্যা হরিসাধন আমার এ সর্বনাশ করল! আপনে যেমন অর্ডার দিছলেন, আমার বেয়াইমশয় সিঙ্গিবাবুও দিছিল। তো কথা হইল..."

কর্নেল বললেন, "সিঙ্গিমশায়ের অফিস থেকে বইটা চুরি গেছে।"

জগমোহন ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। তারপর গলায় কাকুতিমিনতি ফুটিয়ে বললেন,"যা লইয়া দিব্যি করতে বলবেন, করুম স্যার! আর যার লগে করি, বেয়াইমশয়ের লগে তঞ্চকতা করুম না।"

"শুনুন জগমোহনবাবু! যা হবার হয়ে গেছে। আর কখনো রামশংকর শর্মার আত্মচরিতের ধারেকাছে যাবেন না। কেউ লক্ষ টাকা দিতে চাইলেও ও বই যোগাড় করার চেষ্টা করবেন না। সোজা বলে দেবেন, পাওয়া যাবে না।"

"আবার? মুখোশপরা লোকটাও হেই কথা কইয়া গুলি ছুড়ছিল না? বইয়ের গাদায় গুলি লাগল। হেই না বাঁইচ্যা গেলাম স্যার!"

"ঠিক আছে। আপনি আসুন।"

জগমোহন দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরলেন। কর্নেল বললেন, "কিছু বলবেন?"

"যে কথাটা জিগাইতে আইছিলাম, হেই কথাটাই বাদ।" জগমোহন একটু হাসলেন। "রেয়ার বুকসের কারবার করিয়া চুল পাকাইলাম স্যার! কিন্তু রামশংকর শর্মার আত্মচরিত কী এমন বই যে এত গন্ডগুল বাধছে? এদিকে আপনিও কইলেন, সাপের গর্তে হাত ভরছিলাম। ক্যান একথা কইলেন স্যার?"

"জগমোহনবাবু!" কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "বইখানা আসলে ভীষণ অপয়া। ওই বই নিয়ে বেশি মাথা না ঘামালেই ভাল। জানেন তো? যত হাসি তত কান্না/

বলে গেছেন রাম শন্না। ইনি হলেন সেই রাম শন্না। অতএব যা বললুম, মনে রাখবেন।"

"হু, বুঝছি।" বলে জগমোহন চলে গেলেন। কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। হয়তো বুঝলেন, হাসতে মানা।

ঘরের ভেতর দিনশেষের ছায়া গাঢ় হচ্ছিল। কর্নেল সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দিলেন। তারপর পায়চারি করতে করতে বললেন, "তাহলে ব্যাপারটা কেমন জট পাকিয়ে গেল, জয়ন্ত! বোম্বের কে এক রোডরিগ সায়েব রামশর্মার আত্মচরিতের খবর রাখেন। রামদুলাল সিংহকে বইটা যোগাড় দিতে বলেছিলেন তিনি। জগমোহন হল সিঙ্গিমশায়ের বেয়াই। ভৈরবগড় রাজবাড়ি থেকে হরিসাধন এর আগে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই চুরি করে এনেছে। কাজেই জগমোহন তার শরণাপন্ন হল। হরিসাধন বই চুরি করে এনে বেচল। তারপর দুটো ঘটনা ঘটল। রামদুলালের অফিস থেকে সেই বই চুরি এবং জগমোহনের দোকানে মুখোশধারীর হামলা। সত্যিকার পিস্তল ছোঁড়েনি সে। বইয়ের গাদায় গুলির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি। তার মানে, থিয়েটারের পিস্তল নিয়ে এসেছিল। হুঁ—জগমোহনকে ভয় দেখাতেই এসেছিল।...জয়ন্ত, আমার অনুমান সত্য। সে আসলে জগমোহনকে বোঝাতে চেয়েছে যে, এই বই আর যেন বেচাকেনা না করে জগমোহন।...কিন্তু কেন?"

"তাহলে তার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না।"

"কী ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না বলতে চাইছ তুমি?"

"পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেকের—যার দাম হয়তো বিদেশে কোটি-কোটি ডলার।"

কর্নেল হাসলেন। "তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ, ডার্লিং! একজ্যাক্টলি তাই। কেউ বা কারা টের পেয়েছে, রামশর্মার আত্মচরিতের ভেতর স্যাটর নামে ঐতিহাসিক পেরেক লুকিয়ে রাখার কোনো সূত্র আছে।...হুঁ, রোডরিগেরও উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে টেক্কা দিয়ে বইটা হয়তো অন্য একজন হাতিয়ে নিল।"

"সিঙ্গিমশায়ের অফিসে আর মৈত্র না এস মৈত্র নামে যে লোকটা এসেছিল, সে নয় তো?"

গোয়েন্দাপ্রবর সায় দিলেন। "ঠিক, ঠিক। এখন কথা হচ্ছে, এই মৈত্র লোকটা যেই হোক, সে রোডরিগের পরিচিত। তার পরিচিতি নয় শুধু, তার অন্তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। সে রোডরিগের সঙ্গে সিঙ্গিমশায়ের যোগাযোগের কথা জানতে পেরেছিল। তারপর ছুটে এসেছিল কলকাতায়।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন। তারপর আপনমনে বললেন, "কিন্তু কোথায় আছে সেই পেরেক? মিশরীয় চিত্রলিপিতে পাঁচটা পাখি! তার একটা অর্থ: The Sower Arepo holds the wheels carefully. প্রথমে গলগথা বধ্যভূমি থেকে যিশুর দেহ কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন পেরেক পাঁচটা কেউ খুলে নিয়েছিল ক্রুশ থেকে। তাহলে কি আরেপো নামে এক চাষির চতুষ্কোণ শস্যক্ষেত্রে সেগুলো পুঁতে রাখা হয়েছিল?...তারপর কেউ উদ্ধার করে ইথিওপিয়ার দুর্গে নিয়ে যায়।...একটা পেরেক পেলেন রামশংকর শর্মা।... SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS? রহস্যময় শব্দবর্গ! শব্দগুলোতে লেগেছে ROATSEP মোট সাতটা বর্ণ। এই সাতটা বর্ণে কতগুলো অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করা যায়, দেখা যাক।"

হঠাৎ উঠে গিয়ে কোণের টেবিলে বসলেন কর্নেল। তারপর প্যাডের ওপর কলম নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। বুঝলুম,

বুড়োকে এবার ভূতে পেয়েছে। এ ভূত ঘাড় থেকে নামতে রাত পুইয়ে যেতেও পারে। তাই ষষ্ঠীচরণের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললুম, "তোমার বাবামশাইকে বলে দিও, আমি গেলুম।"

ষষ্ঠী ঘাড় নাড়ল। মুখে মুচকি হাসি।...

সেদিনই অনেক রাতে টেলিফোনের বিরক্তিকর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। সাংবাদিক হওয়ার এই এক জ্বালা। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কোনো কর্তাব্যক্তি না হয়ে যান না। হয়তো কোথায় গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনা, মন্ত্রীর ওপর বোমা, কিংবা কোনো ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুরে কী গণ্ডগোল। হয়তো শুনব, এখনই রওনা হও অকুস্থলে। জ্বালাতন!

খাপ্পা হয়ে ফোন তুলে বললুম, "কী হয়েছে?" তারপর আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর গলা শুনতে পেলুম।

"ডার্লিং! রাত দুটোয় তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য খুবই দুঃখিত।"

"বুড়োমানুষরা অনিদ্রায় ভোগেন, অন্যদেরও ভোগান। বলুন!"

"জয়ন্ত! সেই সাতটা অক্ষর থেকে এইমাত্র একটা নতুন শব্দ বেরিয়ে এসেছে। বিস্ময়কর যোগাযোগ, ডার্লিং! নদীয়া জেলার যে গ্রামে রামশর্মার বাড়ি ছিল, তার প্রাচীন নাম কি ছিল জানো? সাতপুর।"

"বেশ তো। সেজন্য এত রাতে ফোন করার কী দরকার হল?"

"জয়ন্ত, জয়ন্ত! সাতপুরকে বিদেশী উচ্চারণে রোমান হরফে পেয়েছি। SATPORE!"

"খুব ভাল কথা! তাতে কী হয়েছে?"

'SATOR, AREPO, TENET, ROTAS, OPERA থেকে কী আশ্চর্যভাবে বেরিয়ে এল SATPORE? প্রাচীন পৃথিবী রহস্যময়, জয়ন্ত! আর শোনো, কাল সকাল নটায় তৈরি থেকো। আমরা সাতপুর অর্থাৎ বর্তমান

রামশংকরপুরে যাচ্ছি। সাড়ে নটায় শেয়ালদায় ট্রেন।"

"কাল আমার অফ-ডে নেই। সপ্তাহে মাত্র একদিন অফ-ডে পাই।"

"জয়ন্ত, একটু আগে রামশংকরপুর থেকে রামশন্নার বংশধর প্রণবশংকর বাঁড়ুজ্যে ট্রাংককল করেছিলেন। ভৈরবগড়ের রাজাবাহাদুর ওঁর কুটুম্ব। রাজাবাহাদুরের পরামর্শে আমাকে ট্রাংককল করা। রাত দশটায় প্রণবশংকরের বাড়ির পেছনের বাগানে ওঁর নিরুদ্দিষ্ট ভাই উমাশংকরের ডেডবডি পাওয়া গেছে। বুঝতে পারছ? তিনমাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন উমাশংকর। হঠাৎ ওঁর ডেডবডি..."

কথা কেড়ে বললুম, "ঠিক আছে। সকাল ৯ টায় তৈরি থাকব।" তারপর ফোন রেখে চিত হয়ে শুয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। টের পেলুম, আমার মাথার ভেতর ঘুঘু ডাকছে!...

॥ তিন ॥

শহরে-গ্রামে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেলে যা দাঁড়ায়, তার নাম রামশংকরপুর। গঙ্গার ধারে একেবারে শেষপ্রান্তে রাম শন্নার তৈরি বিরাট ঐতিহাসিক দালানবাড়ি। নিরিবিলি জায়গা বলা যায়। ঘন গাছগাছালি আর এন্তার ঝোপজঙ্গল গঙ্গাতীরের উর্বর মাটিতে যথেচ্ছ গজিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই বাঁড়ুজ্যেবাড়ি থেকে উত্তরে একটুখানি এগোলেই অন্যরকম দৃশ্য। বাজার, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, থানা, কোর্টকাছারিতে জমজমাট। শহরের মতো লোকের ভিড় আর যানবাহনের দাপট।

একর-সাতেক জায়গার ঠিক মাঝখানে দোতলা প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ি। চারদিকে কোথাও ফাঁকা ঘাসজমি, কোথাও সবজিখেত, কোথাও ফুলফলের ক্ষয়াটে বাগান। একটা পুকুর পর্যন্ত আছে। সারা চৌহদ্দি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু সে-পাঁচিলের অবস্থা বাড়িটার চেয়ে

জরাজীর্ণ। কোথাও ভেঙেচুরে গেছে ; কোথাও পাঁচিল ফুঁড়ে গাছও গজিয়েছে। পশ্চিমে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের দশাও করুণ। গঙ্গা ঘাট থেকে একটু দূরে সরে গেছে কালক্রমে। এই দেউড়ির কপাট কবে লোপাট হয়ে গেছে। সেখান দিয়ে ঢুকলে বর্মি বাঁশের একটা ঝাড়। তার পাশে পুরনো এক ফোয়ারা। কবে মরেহেজে গেছে ফোয়ারাটা। তার পাথুরে গা ফাটিয়ে আগাছা গজিয়েছে। মাঝখানে টুটাফাটা স্তম্ভের ওপর একটু ঝুঁকে যেন ঝারিতে জল ভরছে এক অপ্সরা। কিন্তু তার মাথাটাই নেই।

মুণ্ডুকাটা অপ্সরার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, "রামশর্মা দেশে ফিরে রাজা-রাজড়ার মতো জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। তার একটা নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছ! এই অপ্সরামূর্তি কিন্তু মোটেও দিশি নয়। ত্রিনিদাদের বাড়ি থেকে বহু ঝক্কি পুইয়ে বয়ে এতদূরে এনেছিলেন শর্মামশাই। উনি বেঁচে থাকলে অপ্সরার মুণ্ডু নেই দেখে খুব কষ্ট পেতেন।"

প্রণবশংকর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "১৯৪২ সালের ঝড়ে ওখানে একটা প্রকাণ্ড শিরীষগাছ ভেঙে পড়েছিল। একটা ডালের ধাক্কায় মুণ্ডুটা ভেঙে গিয়েছিল।"

কর্নেল বললেন, "ফোয়ারাটা পাঁচকোনা দেখছি!...হুঁ, ভেনিসের ব্রুগো স্কোয়ারে ঠিক এমনি একটা ফোয়ারা দেখেছিলুম। তবে তার কেন্দ্রে পেতলের যে মূর্তি আছে, সেটা সম্ভবত দেবী ইস্তারের। ইস্তার ছিলেন প্রাচীন সুমেরের যুদ্ধদেবী। কিন্তু তাঁর মূর্তির পায়ের তলায় পাঁচকোনা ফোয়ারা হল খ্রিস্টিয় পবিত্র নক্ষত্রের প্রতীক। ওই নক্ষত্র দেখে পুবদেশের জ্ঞানীরা টের পেয়েছিলেন যিশু জন্মেছেন। তাঁরা নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে বেথেলহেমের আস্তাবলে পৌঁছান।"

বলে কর্নেল পায়ের কাছে ঘাস থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিলেন। হলদে রঙের ছেঁড়া কাগজকুচি মনে হল। সেটা ভাল করে দেখে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর চারপাশের ঘাসে কিছু খুঁজতে থাকলেন। ঘাসফড়িংও হতে পারে। ঘাসফড়িংও ওঁর চর্চার বিষয় বলে জানি। প্রণবশংকর কিন্তু কর্নেলের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বোধ করি মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন। বারোটা নাগাদ পৌঁছুনোর পরেই উনি আমাদের হত্যাকাণ্ডের জায়গাটা দেখাতে নিয়ে এসেছেন। ফোয়ারার কাছেই ওঁর নিরুদ্দিষ্ট ভাই উমাশংকরকে খুন করা হয়েছে। বডি সকালে পুলিশ মর্গে নিয়ে গেছে। আচমকা কেউ উমাশংকরের মাথায় সম্ভবত লোহার রড দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। এক আঘাতেই মৃত্যু হয়—কারণ শরীরে আর কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

কর্নেল ওসব বিবরণে একটুও কান করেননি। শুধু রামশর্মার কথা নিয়েই বকবক করছেন। এতে আমারও বিরক্তি আসছিল। কর্নেল এবার গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলার চোখে রেখে গাছের পাখি দেখছেন। প্রণবশংকরকে সহানুভূতি দেখানোর জন্য ওঁর ভাইয়ের প্রসঙ্গে কথা বললুম। "উমাশংকর কতদিন আগে নিখোঁজ হন, মিঃ ব্যানার্জি?"

"তা মাসতিনেক হবে।"

"কোনো ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কী?"

"কোনো ঝগড়াঝাটির প্রশ্নই ওঠে না। তবে ছোটকু একটু জেদি প্রকৃতির ছিল। মাঝেমাঝে তুচ্ছ কথায় ভীষণ রেগে যেত। কিন্তু হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার আগের রাতে ওর মেজাজ অত্যন্ত শান্ত দেখেছিলুম। রাতে একসঙ্গে দুভাই মিলে খাওয়াদাওয়া করলুম। দিব্যি স্বাভাবিকভাবে গল্পগুজব করল। শুতে গেল। সকালে গঙ্গাধর ওর ঘরে চা নিয়ে গিয়ে দেখে নেই। ভাবল, বাথরুমে আছে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার পাত্তা

নেই।..."

প্রণবশংকর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, "আমার ছেলেপলে নেই। স্ত্রী মারা গেছেন বছর দুই আগে। আমার বয়স ৬৫ বছর হতে চলল। ওই ছোটকুই ছিল আমার বেঁচে থাকার সম্বল। অথচ কী দুর্ভাগা আমি, দেখুন জয়ন্তবাবু! হঠাৎ অমন করে সেই ছোটকু নিপাত্তা হয়ে গেল। কত খোঁজখবর করলুম। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম। তারপর এতদিনে ওর ডেডবডি ফিরে পেলুম।"

"ডেডবডি প্রথম কে দেখেছিল?"

"গঙ্গাধর।" প্রণবশংকর রুমালে চোখ মুছলেন। "গঙ্গাধর এ-বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে আছে। ছোটকুকে সে ছেলের মতো ভালবাসত। গতরাতে—তখন আটটা-সাড়ে আটটা হবে, গঙ্গাধর তার ঘর থেকে একটা আবছা চিৎকার শুনেছিল। ও ভেবেছিল, চোর ঢুকেছে বাগানে—প্রায়ই রাতবিরেতে চোর আসে। গোবিন্দ-মালী হয়তো তাই চেঁচিয়ে তাকে ডাকছে। জ্যোৎস্না ছিল। গঙ্গাধর পশ্চিমের এই বারান্দায় বেরিয়ে আসে। তারপরই দেখতে পায় কে পালিয়ে যাচ্ছে। তাড়া করে এখানে এসেই ছোটকুর বডিতে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যায় গঙ্গাধর। তারপর..."

কর্নেল এগিয়ে এসে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জি, এখানে আপাতত আর কিছু দেখার নেই। এবার চলুন, উমাশংকরবাবুর ব্যাগটা আমি দেখতে চাই।"

প্রণবশংকর পা বাড়িয়ে বললেন, "চলুন। দেখাচ্ছি।"

যেতে যেতে কর্নেল বললেন, "পুলিশের কী ধারণা মিঃ ব্যানার্জি? কিছু জানতে পেরেছেন?"

"হুঁ। পুলিশের ধারণা, উমাশংকর কোনো শত্রুর ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। সেই শত্রু তক্কেতক্কে ছিল। তা না হলে সে পিছনের ফটক দিয়ে বাড়ি ঢুকবে কেন?"

"আপনার কী মনে হয়?"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। শুধু আশ্চর্য লাগছে যে, ছোটকুর শত্রু ছিল, অথচ আমায় কেন বলেনি?"

"আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, নিখোঁজ হবার আগে উমাশংকরবাবুর হাবভাবে কোনো গণ্ডগোল চোখে পড়েনি?"

"তেমন কিছু তো দেখিনি। তবে কিছুদিন থেকে একটু আনমনা হয়ে থাকত যেন। চুপচাপ একা বসে কী যেন ভাবত। রাত জেগে কী সব করত। অনেক রাতে ওর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলে হেসে বলত, কিছু না।"

"কিন্তু উমাশংকরবাবুর সঙ্গে শত্রুতা থাকতে পারে কার?"

"সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। তবে একালের ছেলে। কিছু বলা যায় না। হয়তো ভেতর-ভেতর রাজনৈতিক দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য ওকে প্রকাশ্যে কোনোদিন রাজনৈতিক ব্যাপারে দেখিনি। আমার সঙ্গে কোনোরকম রাজনৈতিক আলোচনাও করত না।"

বাড়ির নীচের তলায় দক্ষিণের একটা বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রণবশংকর তাঁর ভাইয়ের ব্যাগটা আনতে গেলেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখে আরামকেদারায় বসে চুরুট ধরালেন। বললুম, "ফোয়ারার ওখানে সম্ভবত একটা ক্লু সংগ্রহ করেছেন। একটু শুনি, কী ধরনের ক্লু।"

কর্নেল ঠোঁটের কোনায় হাসলেন। "গোয়েন্দারা ক্লু খুঁজলেই নাকি পেয়ে যায়। এটাই সাবেকি পদ্ধতি, ডার্লিং! হ্যাঁ—আমিও একটা কিছু পেয়েছি। তবে সেটা ক্লু কি না জানি না। একটুকরো ছেঁড়া ময়লা কাগজ—মাত্র একবর্গইঞ্চি মাপের। তবে কাগজটুকুর বৈশিষ্ট্য হল, তা খুব পুরনো এবং একটু চাপ লাগালেই গুঁড়ো হয়ে যায়।"

প্রণবশংকর একটা সাধারণ কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "ব্যাগটা একটু তফাতে পড়ে ছিল ঝোপের ভেতর। আপনারা আসবার কিছুক্ষণ আগে গোবিন্দ ওটা কুড়িয়ে পেয়েছে। ব্যাগটা ছোটকুরই বটে। কারণ এই দেখুন ওর প্যান্ট, শার্ট, তোয়ালে, আর সব টুকিটাকি জিনিস।...আরে! এটা আবার কী?"

জিনিসগুলো বের করে টেবিলে রাখছিলেন প্রণবশংকর। চৌকো জিনিসটা দেখে কর্নেল বললেন, "এটা একটা ব্যাটারিচালিত মেটাল-ডিটেক্টর। কোথাও কোনো ধাতব জিনিস লুকোনো থাকলে এর সাহায্যে খুঁজে পাওয়া যায়।"

চমকে উঠেছিলুম। বললুম, "তাহলে কি উমাশংকরবাবু..."

গোয়েন্দাপ্রবর এমন কটমটিয়ে তাকালেন যে মুখ বন্ধ করলুম তক্ষুনি। প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন, "মেটাল-ডিটেক্টর দিয়ে কী করত ছোটকু?"

সে-কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল ব্যাগের ভেতর হাতড়ে বললেন, "হুঁ, বুঝেছি। আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি,

ভৈরবগড়ের রাজাবাহাদুরকে রামশংকর শর্মার আত্মচরিত কবে আপনি উপহার দিয়েছিলেন ?"

প্রণবশংকর স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, "গত অগস্ট মাসে। এ অঞ্চলে কী একটা কাজে উনি এসেছিলেন। এদিকে এলেই আমার বাড়িতে ওঠেন। বৈবাহিকসূত্রে ওঁদের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতার সম্পর্ক।"

"রাজাবাহাদুরকে বইটা দেওয়ার জন্য উমাশংকরবাবু কি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভীষণ খাপ্পা হয়েছিল আমার ওপর। আমি ওকে বুঝিয়ে বললুম, বইটা এখানে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। বরং ওঁর লাইব্রেরিতে থাকলে যত্ন হবে। তাছাড়া রাজাবাহাদুরও বলেছিলেন, বইটা আবার উনি ছাপার ব্যবস্থা করবেন।"

"রাজাবাহাদুরের সঙ্গে উমাশংকরের সম্পর্ক কেমন ছিল ?"

প্রণবশংকর একটু ইতস্তত করে বললেন, "এটুকু বলতে পারি, রাজাবাহাদুর এ-বাড়ি এলে ছোটকু ওঁকে এড়িয়ে থাকত। আড়ালে ওঁর হামবড়াই ভাবের জন্য খুব ঠাট্টা-তামাশা করত। বলত, যাত্রাদলের রাজা। আসলে ছোটকুটা বরাবর একটু বিদ্রোহীটাইপের মানুষ ছিল। সবাই যাকে সম্মান করছে, ও তাকে তুচ্ছ করবেই করবে।"

"উনি কি ভৈরবগড় রাজবাড়িতে যেতেন ?"

"কে ? ছোটকু ?" প্রণবশংকর মাথা নাড়লেন। "সেই ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে যা গেছে-টেছে। বড় হয়ে আর যায়নি। বলত, রাজাগজাদের যা গুমোর—গেলে চাকর ভেবে পা টিপতে বলবে। দরকার নেই গিয়ে।"

কর্নেল মন্তব্য করলেন, "হুঁ—উমাশংকরবাবুর মানসিক গঠনটা বুঝতে পারছি।" তারপর ব্যাগের তলা থেকে একটা কাগজকুচি বের করে পরীক্ষা করতে থাকলেন।

প্রণবশংকর অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর রাখা ছোটভাইয়ের শার্টটা ভাঁজ করছিলেন। বললেন, "ব্যাগে কী আছে ভাল করে এখনও দেখিনি। মানিব্যাগটা অবশ্য পাওয়া গেছে। যে প্যান্টটা পরে ছিল, তার হিপপকেটে ওটা পাওয়া গেছে। টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না।"

কর্নেল বললেন, "মানিব্যাগটা একটু কষ্ট করে নিয়ে আসবেন ?"

"এনে দিচ্ছি।" বলে প্রণবশংকর চলে গেলেন।

কর্নেল এবার ব্যাগ রেখে প্যান্ট ও শার্টটা নিয়ে পড়লেন। শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করে খুলে দেখলেন। চুপচাপ বসে ঘুঘুমশায়ের কাণ্ডকারখানা দেখছিলুম। চোখে চোখ পড়লে বললেন, "জন্মান্তরবাদে আমার বিশ্বাস নেই জয়ন্ত! কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। যেমন ধরো, রামশংকর শর্মা! এক দুর্দান্ত সাহসী মানুষ! অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত সবসময়। তিনিই যেন তাঁর বংশধর উমাশংকরের মধ্যে পুনর্জন্ম নিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।..."

প্রণবশংকর মানিব্যাগটা নিয়ে এলে কর্নেল কথা থামিয়ে সেটা নিলেন। বললেন, "কিছু বের করা হয়নি তো মিঃ ব্যানার্জি ?"

"না, না! বের করার প্রশ্নই ওঠে না।"

কর্নেল মানিব্যাগের ভেতর থেকে কয়েকটি মুদ্রা বের করে বললেন, "হুঁ—যা ভেবেছিলুম। এই মুদ্রাগুলোর মধ্যে দুটো মুদ্রা ত্রিনিদাদের।"

প্রণবশংকর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, "ত্রিনিদাদের মুদ্রা কোত্থেকে পেলেন উমাশংকর ?"

কর্নেল বললেন, "ত্রিনিদাদে। আবার

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান
লিরিল। সবুজ তরঙ্গ— লেবুর চনমনে
সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে
হ'তে লিরিল··· স্নানের পর আপনি
হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিনটাস - LR.27.1810
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

কোথায় পাবেন ?"

প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন, "সে কী ! ছোটকু ত্রিনিদাদ গিয়েছিল নাকি ?"

"হ্যাঁ, মিঃ ব্যানার্জি ! ওঁর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে ।"

প্রণবশংকর বললেন, "আমাব বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে । রাম শর্মা শুনেছি ত্রিনিদাদ মুলুকে ছিলেন । সেখানে ঘরবাড়িও করেছিলেন । ওঁর আত্মচরিত ভাল করে পড়িনি অবশ্য । তবে ছোটকু ...হ্যাঁ, হ্যাঁ ! মনে পড়েছে বটে, ছোটকু মাঝে মাঝে বলত, রাম শর্মার ভিটে দেখতে যাবে । কিন্তু সে তো সেই সাউথ আমেরিকার মাথায় । ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ।"

আমি বললুম, "তাহলে পাসপোর্ট থাকা উচিত সঙ্গে । পাসপোর্ট কোথায় ?"

কর্নেল বললেন, "বোঝা যাচ্ছে না পাসপোর্টটা কী হল । যাই হোক, মিঃ ব্যানার্জি, একটা জিনিস হাতানো খুনির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল । সেটা সে হাতাতে পেরেছে । কারণ, ব্যাগের ভেতর এবং ফোয়ারার কাছে আমি দুকুচি নমুনা খুঁজে পেয়েছি ।"

প্রণবশংকর বললেন, "কী বলুন তো ?"

"রামশংকর শর্মার আত্মচরিত ।" বলে কর্নেল এবার সেই পকেট-নোটবইটার পাতা ওলটাতে থাকলেন । "হুঁ—পাসপোর্টের নাম্বার টোকা আছে । তার মানে পাসপোর্ট ছিল । ...এখানে দেখছি ইংরেজিতে দু' লাইন নোট ।'Reported to Police. Trabanka P. S. Case No. P. F. 223 dated 15-10-80.' তার মানে পাসপোর্টটা নিশ্চয় চুরি গিয়েছিল । ত্রাবাংকা নামে কোনো জায়গার থানায় ডাইরি করেছিলেন । কোন্ তারিখে উনি নিপাত্তা হন মিঃ ব্যানার্জি ?"

"সাতই অক্টোবর ।"

"হুঁ—আরে । এখানে দেখছি : 'Appointment with F. Rodrigue at 6 P. M.' সেই রোডরিগ !! রামদয়াল সিঙ্গিকে যে বইটা যোগাড় করে দিতে বলেছিল !" কর্নেল মুখ তুলে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জি, আপনার ভাই ত্রিনিদাদ গিয়ে পাসপোর্ট এবং সম্ভবত টাকাকড়িও চুরি গিয়ে বিপদে পড়েন । সেখানে রোডরিগ নামে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হয় । এটুকু বুঝতে পেরেছি, রোডরিগ পয়সাওলা ব্যবসায়ী । নানা দেশে তার ব্যবসা-বাণিজ্য আছে । উমাশংকরবাবু তাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন এবং তাঁর সাহায্য পেয়েই ত্রিনিদাদে তিন মাস তিনি থাকতে পেরেছিলেন । শুধু একটা ভুল করেছিলেন । রোডরিগকে আত্মচরিতের কথাটা বলা ঠিক হয়নি । জিনিসটার দাম কোটি কোটি ডলার—যদি উদ্ধার করা হয় । ...হুঁ, জট অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে । কিন্তু রোডরিগ তো এখন বোম্বেতে । এতদূরে ঠিক সময়মতো লোক পাঠিয়ে উমাশংকরের কাছ থেকে আত্মচরিত হাতানো ... নাঃ ! এখনও জট থেকে যাচ্ছে ।"

প্রণবশংকর হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন । এই সময় গঙ্গাধর এসে বলল, "খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে বড়বাবু । পিসিমা বললেন, দুটো বাজতে চলল । ওঁদের খবর দে ।"

প্রণবশংকর উঠলেন । "তাই তো ! ছি, ছি—বড্ড দেরি হয়ে গেল খেতে । দয়া করে এবার আসুন কর্নেল ! কথাবার্তা যা হবার পরে হবে । আমাদের তো অরন্ধন । নেহাত আপনাদের জন্য দু' মুঠো ডালভাতের ব্যবস্থা করেছি ।"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, স্নান করবে নাকি ? আমি অবশ্য ভোরে ও-কাজ সেরেই বেরিয়েছি ।"

আঁতকে উঠে বললুম, "এই হাড়কাঁপানো শীতে মফস্বলের জলে স্নান ? বাপ্স্ ! কী ঠাণ্ডা এখানে !"

গঙ্গাধর বলল, "গরম জল করে দেব স্যার ?"

"থাক।"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "তুমি নিশ্চয় আগের জন্মে বেড়াল ছিলে ডার্লিং ! তাই জলকে এত ভয়।"

বললুম, "আপনি তাহলে আগের জন্মে উদ্‌বেড়াল ছিলেন। তাই শীতের ভোরে জল মাখতে ভালবাসেন।"

॥ চার ॥

খাওয়ার সময় তদারক করছিলেন এক বৃদ্ধা। প্রণবশংকর আলাপ করিয়ে দিলেন। দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। উনি ছাড়া আর কোনো মহিলা এ-বাড়িতে নেই। ওঁর নাম কুমুদিনী। খুব স্নেহপ্রবণ মহিলা। আদরযত্ন করে খাওয়াচ্ছিলেন। কথায়-কথায় দুঃখ করে বললেন, "ছোটকু বেঁচে থাকলে অতিথিদের জন্য কী যে ছুটোছুটি করত ! পরিতোষকে বললুম ব্যবস্থা করতে। পরিতোষের হাজারটা কাজ। তবে বাবা, আজ তো অরন্ধন বাড়িতে। আপনাদের জন্য নিয়মভঙ্গ করতে হল।"

প্রণবশংকর বললেন, "পরিতোষ বেচারার দোষ নেই। কাল সারা রাত লেগেছে। থানা পুলিশের হাঙ্গামা তো কম নয়। সকালে আবার দৌড়ল থানায়। সেখান থেকে মর্গে। যতক্ষণ না বডি নিয়ে আসবে, ততক্ষণ হয়তো ওর শান্তি নেই। তারপর আর আসেনি পরিতোষ ?"

কুমুদিনী বললেন, "এসেছিল একটু আগে। আবার বেরুল।"

"আজ আর ওর ফার্মে যাওয়া হল না। কী যে হচ্ছে সেখানে কে জানে ! পরিতোষের ভয়ে কেউ ফসলে হাত দিতে সাহস পায় না !"

কর্নেল বললেন, "পরিতোষ কে ?"

প্রণবশংকর বললেন, "এ-বাড়ির কেয়ারটেকার বলতে পারেন, ম্যানেজারও বলতে পারেন। ছোটবেলা থেকে এ-বাড়িতে আছে। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। মাঠে কৃষিখামার করেছি। তাও দেখাশোনা করে। বাড়িরও সবকিছু তদারক করে। ও না থাকলে আমাকে পথে বসতে হত। ছোটকু তো বরাবর নিষ্ক্রিয়—কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে সে থাকেনি। বলত, 'নুটু থাকতে আবার আমায় কেন ! নুটু একা একশো।' সত্যি তাই। তবে পরিতোষ বেচারার মুখের দিকে এখন তাকানো যায় না। ছোটকুর ব্যাপারে সে একেবারে ভেঙে পড়ার দাখিল। ছেলেবেলা থেকে দুটিতে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। পড়াশুনা করেছে। দুটিতে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। ছোটকু নিরুদ্দেশ হলে পরিতোষ সারা ভারত ওর খোঁজে ছোটাছুটি করেছিল। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। সে এক অবস্থা !"

"পরিতোষবাবু এলে একটু পাঠিয়ে দেবেন ? ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"আসুক। বলব'খন।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে কর্নেল বললেন, "আপনার টেলিফোন কোন্ ঘরে আছে মিঃ ব্যানার্জি ?"

"নীচের ঘরে। ওখানে পরিতোষ অফিসমতো করেছে। সবই ওর দায়িত্বে। আমার বয়স হয়েছে—কিছু দেখাশোনা করতে পারিনে।"

"আমি একটা ট্রাংককল বুক করতে চাই।"

"স্বচ্ছন্দে। আসুন, আসুন।"

আমি ওঁদের সঙ্গে গেলুম না। ভাতঘুমের টান ধরেছে সঙ্গে সঙ্গে। একতলায় নেমে সটান আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ার আগে বারান্দার রোদ্দুরে বসে মৌজ করে সিগারেট টানতে থাকলুম। বরাবর এটাই অভ্যাস। সিগারেট শেষ করে ঘরের ভেতর

বিছানায় কম্বলটার দিকে লোলুপদৃষ্টে তাকাচ্ছি, কর্নেল এসে গেলেন। এসেই চোখ পাকিয়ে বললেন, "উঁহু ! দিনদুপুরে ঘুমোনো মোটেই ভাল কথা নয়। আয়ু ক্ষয় হয়। বরং চলো, আমরা একবার ঝটপট ভৈরবগড় ঘুরে আসি।"

"ভৈরবগড় ! সে আবার কোথায় ?"

"বেশি দূরে নয়। গঙ্গা পেরুলে বাস। বাসে চেপে মাইল-পাঁচেক মাত্র।"

মনে মনে বুড়োর মুণ্ডুপাত করতে করতে পা বাড়ালুম। বাজার এলাকার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বললুম, "হঠাৎ ভৈরবগড়ে কী ব্যাপার বলুন তো ?"

"রাজবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে আসি—এত কাছে এসে পড়েছি যখন। তাছাড়া হরিসাধনেরও খোঁজখবর নেব।"

"হরিসাধন—মানে সেই নেশাখোর বইচোর ! তাকে কি রাজাবাহাদুর আর বাড়ি ঢুকতে দিয়েছেন ?"

"চলো তো, দেখি।"

বাজার এলাকার ভিড় ঠেলে আমরা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছলুম। একটা নৌকো ভাড়া করে ওপারে পৌঁছতে প্রায় একটা ঘণ্টা লেগে গেল। কিন্তু খুব সুন্দর এই জার্নি। কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে পড়ন্ত শীতের বেলায় জলপাখি দেখে নিলেন।

বাসের ভিড় দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। কলকাতার বাসে ভিড় হয় বটে, কিন্তু এর তুলনায় সে-ভিড় কিছুই না। বাসটার আগাপাছতলা লোক ভর্তি। তবু কণ্ডাক্টর চ্যাঁচাচ্ছে, "চলে আসেন ! চলে আসেন ! ছেড়ে গেল ! ছেড়ে গেল ভৈরবগড়-দাঁইহাট-কাটোয়া-আ-আ !"

হয়তো কর্নেলের সায়েবি চেহারা ও বেশভূষা, কিংবা দাড়িটাড়ি দেখে কণ্ডাক্টার ড্রাইভারের ডান ও বাঁ-পাশ থেকে দুই বেচারাকে হিড়হিড় করে নামিয়ে আমাদের জায়গা করে দিল। হতভাগা যাত্রীদ্বয়কে সে কোথায় গুঁজল কে জানে ! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "পৃথিবীটা যে নিছক সুখের জায়গা, মাঝে-মাঝে এটা টের পাওয়া দরকার ডার্লিং !"

"কিন্তু অন্যদের বঞ্চিত করে এভাবে জায়গা নেওয়া কি উচিত হল ?"

ড্রাইভার একগাল হেসে বলল, "ওদের কথা ভাববেন না স্যার। ওরা আমার নিজের লোক। বিনিপয়সায় যাচ্ছে। ভৈরবগড়ে আপনারা নামলে ওদের ডেকে নেব।"

দুধারের গাছপালাঘেরা পিচের রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে চলেছে। পাঁচ মাইল যেতে অন্তত বার-পাঁচেক বাস থামল। কিছু যাত্রী নামল, উঠল তার দ্বিগুণ। আমাদের নামিয়ে যখন বাসটা চলে গেল, তখন তাকে দেখাচ্ছিল যেন চলন্ত মৌচাক—তবে মৌমাছিগুলো মানুষ এই যা।

বাস-রাস্তার মোড় থেকে সাইকেলরিকশা করে এগিয়ে আমরা রাজবাড়ির ফটকের কাছে নামলুম। একজন দারোয়ান কর্নেলকে দেখামাত্র মিলিটারি সেলাম ঠুকল। বুঝলুম কর্নেলকে সে চিনতে পেরেছে। ওপাশের একতলা সারবদ্ধ ঘরের বারান্দায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে চায়ের পেয়ালা। তিনি দৌড়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

একটু পরে রাজবাড়ির বিশাল ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করতে করতে রাজাবাহাদুর এসে গেলেন। প্রণবশংকরের বয়সী মানুষ। পরনে সাদাসিধে পাঞ্জাবি-পাজামা। চোখে পুরু লেন্সের কালো চশমা। কিন্তু রোগা টিঙটিঙে গড়ন। বললেন, "খুব শিগ্‌গির এসে পড়েছেন আপনারা। আমি ভেবেছিলুম, ছটার আগে পৌঁছতে পারবেন না। তবে দেখুন কর্নেল, আমার কিন্তু কোনো অপরাধ নেই। আমি জিপ পাঠাতে চাইলুম, আপনি বারণ করে দিলেন।"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "আমার এই তরুণ বন্ধু একজন সাংবাদিক। ওকে দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে একটুখানি অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছি। এবার কলকাতা ফিরে দৈনিক সত্যসেবকে মফস্বলের বাসযাত্রীদের কথা লিখবে, আশা করি।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যে বুঝতে পারলুম, কর্নেল রামশংকরপুরে প্রণবশংকরের বাড়ি থেকে ফোন করে আসার কথা জানিয়েছেন। আলাপ-পরিচয় এবং কফি খাওয়ার পর উমাশংকরবাবুর হত্যাকাণ্ডের কথা উঠল। রাজাবাহাদুর গম্ভীর মুখে বললেন, "ঘটনাটা ভারী অদ্ভুত। উমাশংকর একটু তেজি স্বভাবের ছিল বটে; কিন্তু ওকে কেউ খুন করবে ভাবাও যায় না। তাছাড়া তিন মাস গা-ঢাকা দিয়েই বা কেন রইল, আমার কাছে সবটাই একটা রহস্য। তাই গতরাতে প্রণবদা ফোনে ঘটনাটা যখনই আমাকে জানালেন, আমার মনে হল, আপনার শরণাপন্ন হওয়া উচিত। পুলিশ এ-ব্যাপারে কতদূর কী করবে ভরসা হয় না। তো, আমি নিজেও বহুবার আপনার লাইন পাবার চেষ্টা করলুম। এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ওয়ার্থলেস। কলকাতা ধরতেই পারল না। তখন প্রণবদাকে ফের ফোন করে বললুম, আপনি দেখুন চেষ্টা করে। নাম্বার দিচ্ছি।"

কর্নেল বললেন, "হরিসাধনবাবুর খবর কী?"

"হরিসাধন?" রাজাবাহাদুর বাঁকামুখে বললেন, "বইটা চুরি করে ব্যাটাচ্ছেলে আর এ-বাড়ি ঢোকেনি। বুঝে গেছে, এবার ত্রিসীমানায় দেখলেই মাথাটি ন্যাড়া করে দেব।"

"আচ্ছা, একটা কথা রাজাবাহাদুর! রাম শর্মার আত্মচরিত প্রণবশংকরের কাছে আপনি উপহার পান গত আগস্ট মাসে। আপনার লাইব্রেরিতে রাখার পর আর কাউকে কি পড়তে দিয়েছিলেন?"

রাজাবাহাদুর মাথা নেড়ে বললেন, "না। লাইব্রেরিতে বইটা রেখেছিলুম দুষ্প্রাপ্য বইয়ের শেলফে। আপনি বাদে কাউকে পড়তে দিইনি। বইটার কথা আর কেউ জানে বলেও মনে হয় না। নইলে যাঁরা উনিশ শতক নিয়ে রিসার্চ করেন, তাঁরা নিশ্চয় খোঁজখবর করতেন। তাছাড়া আমি তো বিস্তর বইটই পড়ি। কোথাও এ বইয়ের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত পাইনি। এর একটাই কারণ থাকতে পারে। ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ে যাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছে, তাঁর ভাই শ্যামশংকর সাহস করে বইটা ছাপলেও বোধকরি এক কপিও কেউ সাহস করে কেনেননি। জগমোহন বোসের মতো লোক, যে এ ধরনের দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজখবর রাখে, সে পর্যন্ত বইটার নাম শোনেনি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন. বলুন তো কর্নেল?"

কর্নেল একটু হাসলেন। "উমাশংকর খুন হওয়ার সঙ্গে বইটার যোগাযোগ রয়েছে।"

"সে কী!"

"উমাশংকর বইটা নিয়ে বহুদিন ধরে মাথা ঘামাচ্ছিলেন।"

"বলেন কী! কেন?"

"অক্টোবরে এসে বইটা পড়ার পর আপনার সঙ্গে পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেক 'স্যাটর' নিয়ে আলোচনা করেছিলুম, মনে আছে তো?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ। খুব মনে আছে। বলেছিলেন, পেরেকটা সম্পর্কে রামশংকর কেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন!"

"প্রণবশংকর হঠাৎ আপনাকে বইটা উপহার দেওয়ায় উমাশংকর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ, উনি পেরেকটার হদিস বই থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পরে যেভাবেই হোক, ওঁর মাথায় ঢুকেছিল, রামশংকর ত্রিনিদাদে

ত্রাবাংকা নামে একটা জায়গায় যে বাড়ি করেছিলেন, সেই বাড়িতেই কোথাও ওটা লুকনো আছে। তাই উনি ত্রিনিদাদে পাড়ি দেন। দাদাকে বলেননি। কারণ, দাদা তাঁকে কিছুতেই যেতে দিতেন না।"

"কিন্তু ত্রিনিদাদে গিয়েও তো জানাতে পারত। এদিকে সবাই ওর জন্য কষ্ট পাচ্ছে।"

"প্রণবশংকরকে তো জানেন। আমার ধারণা হয়েছে, ভদ্রলোক কোনো ব্যাপারে গোপনীয়তা কাকে বলে জানেন না। খুব খোলা মনের মানুষ। পাঁচকান করবেন বলেই হয়তো জানাননি উমাশংকর।"

"ঠিক বলেছেন। প্রণবদার পেটে কথা থাকে না।"

"উমাশংকর ত্রিনিদাদে যাওয়ার পর ওঁর পাসপোর্ট আর টাকাকড়ি চুরি গিয়ে বিপদে পড়েন। সেই সময় রোডরিগ নামে গোয়ার এক বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। অনুমান করা যায়, রোডরিগকে তিনি হতাশা ও ব্যর্থতার চাপে তাঁর ত্রিনিদাদে আসার উদ্দেশ্য খুলে বলেছিলেন। পেরেকটার দাম কোটি কোটি ডলার এখন! এটা কোন্ বড়লোক না সংগ্রহশালায় রাখতে চাইবে। বহু দেশের সরকারও চাইবেন, এটা তাঁদের জাদুঘরে থাক। ভ্যাটিকানে রাখার জন্যও খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুরা এই পবিত্র জিনিসটি দাবি করবেন।"

রাজাবাহাদুর সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ—আপনি সেবারও এসব কথা বলেছিলেন।"

"রোডরিগের সাহায্যে উমাশংকর রাম শর্মার বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। বিস্তারিত কিছু জানি না। তবে বোঝা যায়, কী ঘটেছিল। পেরেক আবিষ্কার করতে না পেরে রোডরিগের সঙ্গে উমাশংকর ফিরে আসেন। তারপর আমরা কিছু ঘটনা ঘটতে দেখেছি। রোডরিগ বোম্বে এসেই কলকাতার ব্যবসায়ী রামদয়াল সিঙ্গিকে বইটা যোগাড় করতে বলে। তার বদলে সিঙ্গিমশাইকে দু' লক্ষ টাকার অর্ডার পাইয়ে দেবার লোভ দেখায়। যেভাবেই হোক, সেটা জানতে পেরে উমাশংকর সতর্ক হয়ে যান। কলকাতায় ছুটে আসেন। ঘটনাচক্রে সেইদিনই সিঙ্গিমশাই বইটা যোগাড় করেছেন জগমোহনের কাছে।"

"ঠিক, ঠিক। ব্যাটাচ্ছেলে হরিসাধনকে দিয়েই জগমোহন এ-কর্মটি করেছিল—এখন বুঝতে পারছি।"

"উমাশংকর জনৈক মৈত্র নাম নিয়ে রোডরিগের ব্যবসার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে সিঙ্গিমশায়ের অফিসে রাত কাটান এবং বইটা পেয়ে যান। তারপর মুখোশ পরে জগমোহনের দোকানে ঢুকে টয় পিস্তল দেখিয়ে তাকে শাসিয়ে যান, যেন এ বইয়ের বেচাকেনা আর না করে। সেই বই নিয়ে সন্ধ্যার পর চুপিচুপি পেছনের ফটক দিয়ে উনি বাড়ি ঢুকছিলেন। কেউ ওত পেতে ছিল। তাঁর মাথায় বাড়ি মেরে বইটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।"

"নিশ্চয় রোডরিগের লোক?"

কর্নেল মাথা নাড়লেন। "বোঝা যাচ্ছে না। চুপিচুপি বাড়ি ঢোকার কারণ—উমাশংকর সম্ভবত দাদার বকুনি খাবার ভয়ে সরাসরি প্রথমেই দাদার মুখোমুখি হতে চাননি। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স হলেও উমাশংকর একটু খেয়ালি ছিলেন। ছেলেমানুষি করতেন বিস্তর। কুমুদিনী দেবীর কাছে এসব কথা শুনলুম।"

"তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু রোডরিগ ছাড়া আর কার পেরেক নিয়ে মাথাব্যথা থাকা সম্ভব। সে জানবেই বা কী করে যে ছোটকু ওই সময় পেছনের ফটক দিয়ে বাড়ি ঢুকবে?"

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন, "একজ্যাক্টলি! এটাই হল আদত প্রশ্ন। সেইজন্যে আমি গোপনে আপনার কাছে

আপনার চুলের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য উন্মোচন করে...
ডাবর আমলা কেশ তেল-
ঘন, কালো, রেশম-কোমল দীর্ঘ চুলের সুপ্রাচীন রহস্য
আপনার সৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ হ'ল আপনার চুল। ডাবরের আমলা কেশ তেল ব্যবহার ক'রে আপনার চুল ঘন কালো দীর্ঘ ও রেশমের মত কোমল রাখুন। প্রতিদিন কেবল কয়েক ফোঁটা তেল আপনার চুলের যত্ন ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রাখে।
ঠাণ্ডা-তাজা-সুগন্ধিত ডাবর আমলা কেশ তেলের রহস্য অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে অসংখ্য নারীর কামনায় লালিত।
ডাবর আমলা কেশ তেল প্রতিদিন দীর্ঘ কেশের যত্নে প্রয়োজিত

জানতে এসেছি, রামশংকপুরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন কেউ কি আপনার কাছে বইটার খোঁজে এসেছিল ?"

"কেউ আসেনি ।" রাজাবাহাদুর চিন্তিত মুখে বললেন ।

"একটু স্মরণ করে দেখুন তো !"

কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করার পর রাজাবাহাদুর বললেন, "নাঃ ! মনে পড়ছে না তেমন কিছু ।"

"বইটি আপনি আবার ছেপে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ?"

রাজাবাহাদুর বললেন, "হ্যাঁ । মার্চ নাগাদ বের করব ভেবে রেখেছিলুম । আপনাকে তো বলেওছিলুম সেকথা । এ মাসেই কলকাতা গিয়ে ভাল একটা প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করতুম । এই তো কিছুদিন আগে প্রণবদা ফোন করে জানতে চাইলেন, কবে বইটা ছাপছি । ..."

কর্নেল নড়ে বসলেন । ওঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল । "প্রণবশংকর জানতে চাইছিলেন ?"

"হ্যাঁ ।"

"কেন হঠাৎ একথা জানতে চাইলেন প্রণবশংকর ? উনি তো বই-টই নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মানুষ নন । সব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন ।"

রাজাবাহাদুর হাসলেন । "হ্যাঁ—আমি ওঁকে ঠাট্টা করে বললুম, এতকাল ধরে বইটা যে নষ্ট হচ্ছিল, আপনাদেরই ছাপানো উচিত ছিল । পূর্ব-পুরুষের লেখা বই । দৈবাৎ আমার চোখে না পড়লে তো নষ্ট হয়েই যেত । ...প্রণবদা বললেন, ঠিকই বলেছ । তখন বইটার মূল্য বুঝিনি ।"

"প্রণবশংকর তাই বললেন ?"

রাজাবাহাদুর কর্নেলের উত্তেজনা লক্ষ করে অবাক হলেন । "আপনি কি প্রণবদাকে ..."

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, "না, না । তা নয় ।" তারপর উঠে দাঁড়ালেন । "তবে এই কথাটাই জানতে চেয়েছিলুম অবশ্য । যাই হোক, রাজাবাহাদুর, আমি এখনই রামশংকরপুরে ফিরতে চাই । এবার কিন্তু আপনার জিপগাড়িটা চাইছি ।"

"অবশ্য, অবশ্য । এক মিনিট, আমি রমেনকে বলে দিচ্ছি । আপনাদের একবারে প্রণবদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে । গঙ্গায় জিপ পার করার নৌকো আছে । অসুবিধে হবে না ।" ...

ফেরার পথে কর্নেলকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করিনি । জিপে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছুতে মিনিট কুড়িরও কম লাগল । নৌকোয় জিপসুদ্ধ পেরুতে মোটে মিনিট-দশেক । যন্ত্রচালিত নৌকোয় গাড়ি পার করার ব্যবস্থা আছে ।

বাঁড়ুজ্যেবাড়ির ফটকে আমাদের নামিয়ে দিয়ে রাজাবাহাদুরের জিপগাড়ি চলে গেল । সাতটা বেজে গেছে । বাড়িটা একেবারে নিশুতি নিঝুম হয়ে রয়েছে । জ্যোৎস্না ও কুয়াশায় চারদিকে কেমন ঝিমন্ত দশা ।

প্রণবশংকর দাঁড়িয়ে ছিলেন বসার ঘরের বারান্দায় । বললেন, "ফিরে এলেন ভৈরবগড় থেকে ? দেখা হল রাজাবাহাদুরের সঙ্গে ?"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ । উমাশংকরবাবু বডি ফেরত আসেনি মর্গ থেকে ?"

"চারটেয় এল । সব রেডি ছিল । দাহ হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে । এই মিনিট-কুড়ি হল শ্মশান থেকে ফিরেছি ।"

কথা বলতে বলতে আমরা দক্ষিণের সেই ঘরে গেলুম—যে ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে । একটু পরে গঙ্গাধর চা দিয়ে গেল । একথা-ওকথার পর কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, কিছুদিন আগে আপনি রাজাবাহাদুরকে ফোনে রাম শর্মার আত্মচরিত ছাপানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন ?"

প্রণবশংকর হঠাৎ এ-কথায় হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ । জিজ্ঞেস

করেছিলুম। কেন বলুন তো ? জিজ্ঞেস করা কি ভুল হয়েছে ?"

"না, না। ভুল নয়।" কর্নেল হাসলেন। "আমার জানবার উদ্দেশ্য, হঠাৎ কেন আপনি কথাটা জানতে চাইলেন রাজাবাহাদুরের কাছে ?"

প্রণবশংকর বিব্রতভাবে বললেন, "দেখুন, ও-সব বই-টইয়ের আমি কিছু বুঝিও না। ইন্টারেস্টও নেই। কোনো ব্যাপারেই নেই। ওই পরিতোষ একদিন বলল যে, বইটা আমাদেরই বের করা উচিত ছিল। আফটার অল, এ-বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষ। রাজাবাহাদুর সত্যি-সত্যি ছাপবেন কিনা কে জানে ! তাই শুনে আমি বললুম, দেখছি খোঁজ নিয়ে।"

"পরিতোষবাবুকে একবার ডাকবেন ?"

প্রণবশংকর ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওকে আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছি। কিন্তু এত ধকলে বেচারার জ্বর এসে গেছে। শ্মশান থেকে ফিরেই শুয়ে পড়েছে লেপমুড়ি দিয়ে। চলুন বরং, ওর ঘরেই যাওয়া যাক।"

আমরা বাড়ির দক্ষিণ ও পূর্বদিক ঘুরে উত্তর-পূর্ব কোণের একটা ঘরের সামনে পৌঁছলুম। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। প্রণবশংকর ডাকলেন, "নুটু ! ও নুটু !" তারপর দরজায় টোকা দিলেন। সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেললেন এবার। দরজাটা ভেজানো ছিল। খুলে গেল।

বিছানায় আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। প্রণবশংকর আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "সর্বনাশ ! জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি ? নুটু, ও নুটু !" বলে তিনি মাথার দিকের লেপ খানিকটা সরালেন

কিন্তু সেখানে বালিশের ওপর পরিতোষবাবুর মাথার বদলে একটা লম্বা পাশবালিশের একটু অংশ দেখা গেল। প্রণবশংকর চমকে উঠেছিলেন। কর্নেল এক টানে লেপটা সরিয়ে দিতেই দেখলুম, বিছানায় পাশবালিশটা মানুষের মতো লম্বালম্বি শোয়ানো রয়েছে। প্রণবশংকর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, "এর অর্থ ?"

কর্নেল বললেন, "পরিষ্কার। পরিতোষবাবু গতিক বুঝে গা ঢাকা দিয়েছেন।"

"অসম্ভব ! এ হতেই পারে না।" বলে প্রণবশংকর খাপ্পা হয়ে বেরুলেন। বাইরে তাঁর হাঁকডাক শোনা গেল। গঙ্গাধরকে ডাকাডাকি করছেন। বলছেন, "দেখ্ তো গঙ্গু, নুটু কোথায় গেল ?"

আমি প্রাজ্ঞ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালুম। উনি ঘরের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখছেন। বালিশ তোশক উলটে টেবিলের কাছে গেলেন। ড্রয়ার টেনে দেখলেন, খোলা। ভেতরে কী সব হাতড়ালেন। তারপর টেবিলের ওপাশে বইয়ের র‍্যাকের কাছে গেলেন। পকেট থেকে টর্চ বেরুল এবার। বললেন, "মাই গুডনেস ! এ-সব কী ! দেখছ জয়ন্ত, কী কাণ্ড ?"

বুঝতে না পেরে বললুম, "না তো। কিচ্ছু ঢুকছে না মাথায়।"

"জয়ন্ত, এই বইগুলো দেখতে পাচ্ছ না ? মোরহেডের লেখা 'মিশরীয় চিত্রলিপির রহস্য'। লর্ড কারনারভনের লেখা 'মমিপ্রথার ইতিহাস'। আর এই দেখ, 'মিশরে রোমানযুগের ইতিহাস'। এটা হল বিখ্যাত বই—'যিশুখ্রিস্ট এবং হারানো পাঁচটি পেরেক'। পরিতোষের ভারী অদ্ভুত ব্যাপার !"

বলে গোয়েন্দাপ্রবর টেবিলের তলা থেকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট টেনে বের করলেন। তারপর দলাপাকানো কাগজ, অ্যাশট্রে থেকে ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো, এইসব আবর্জনা ঘাঁটতে শুরু করলেন।

একটু পরে দেখি, কয়েকটা দলাপাকানে

কাগজ টেনে সমান করে ফেললেন এবং পকেটে ভরতে দেরি করলেন না। তারপর কাগজকুচি কুড়িয়ে মেঝেয় ফেলে জোড়া দেবার চেষ্টা করতে থাকলেন। প্রণবশংকর হন্তদন্ত এসে বললেন, "পরিতোষের এ-আচরণের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। কেন সে এমন অদ্ভুত কাজ করল?"

সে কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মিঃ ব্যানার্জি, গতকাল সকালে কিংবা আগের রাত্রে কলকাতা থেকে কোনো ট্রাংককল এসেছিল কি?"

"এসেছিল। তখন সবে আমি ঘুম থেকে উঠেছি। গঙ্গু বলছিল, নুটুবাবুর কল এসেছে কলকাতা থেকে।"

"কী কথাবার্তা হচ্ছিল শোনেননি?"

গঙ্গাধর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "নুটুবাবু কাউকে বারবার বলছিল, 'বড়বাবু রেগে আছেন। লুকিয়ে সন্ধ্যার পর এসো'। আর বলছিল, 'চোরের ওপর বাটপাড়ি?' খুব হাসছিল। ওই দুটো কথা মনে আছে স্যার।"

কর্নেল বললেন, "উমাশংকরের দ্বিতীয় ভুল এটা।" ...

॥ পাঁচ ॥

আমাদের আস্তানায় ফিরে কর্নেল টেবিলের ওপর কাগজগুলো বিছিয়ে বললেন, "এবার দেখ, জয়ন্ত! অবাক হবে।" দেখে সত্যি অবাক হলুম। কর্নেলের কাছে যে শব্দবর্গ দেখেছিলুম, একটা কাগজে সেটা লেখা রয়েছে।

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

পরের কাগজগুলোতে লেখা আছে:
কাক, কোকিল, কাঠঠোকরা, কাকাতুয়া, কাদাখোঁচা_

AEORPST SATPORE
সাতপুর...
রমাকান্ত কামার/ সুবল বসু/ রায়মণি ময়রা/ সদা দাস...

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "এই বাংলা নামগুলো সম্ভবত নিছক খেলা। ডাইনে-বাঁয়ে যেদিক থেকে পড়বে, নামগুলো একই থাকে। খেলা বলার কারণ, ওর তলায় লেখা আছে: কনক/ জলজ/ নতুন/ নন্দন/ কণ্টক/ চামচা/ মলম... খুব জটিল ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামানোর পর এই একটু রিলিফ আর কি!"

প্রণবশংকর ওঁর মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "কর্নেল! দোহাই আপনার! দয়া করে বলুন, পরিতোষই কি ছোটকুকে খুন করেছে?"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। পরিতোষের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বই হাতানো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খতম।"

"তাহলে কথাটা পুলিশকে এখনই জানানো দরকার। দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম— সেই সাপের বিষদাঁত ভাঙা দরকার।"

প্রণবশংকর রাগে থরথর করে কাঁপছিলেন। কর্নেল তাঁকে শান্ত করতে বললেন, "প্লিজ, আর একটু ধৈর্য ধরুন। এখনও মোক্ষম প্রমাণ আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।"

"কী সেটা?"

"মার্ডার উইপন—যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।"

"সে কি কেউ রাখে? ওই তো পা বাড়ালেই গঙ্গা। ফেলে দিয়েছে।"

"ফেলে দিলেই বরং ধরা পড়ার চান্স ছিল। কারণ গোবিন্দ মালী... এক মিনিট। আসছি।" বলে কর্নেল হঠাৎ হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন।

প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন,

"কোথায় গেলেন অমন করে, বলুন তো জয়ন্তবাবু ?"

"মনে হচ্ছে, গোবিন্দ মালীর কাছে।"

প্রণবশংকর গুম হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

ক্রমশ শীত বাড়ছিল। মফস্বলে এত বেশি শীত আন্দাজ করতে পারিনি। যেমন-তেমন একটা জ্যাকেট চড়িয়ে এসেছিলুম। বিছানা থেকে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে আরামকেদারায় বসতে যাচ্ছি। আলো নিবে গেল। নিশ্চয় লোডশেডিং। বাড়ির ওপরতলায় প্রণবশংকরের ডাকাডাকি শুনলুম। গঙ্গাধরকে হেরিকেন জ্বালতে বলছেন।

বাইরে জ্যোৎস্নায় কুয়াশা জমেছে। প্রাঙ্গণ এবং গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে গা ছমছম করছিল। মিনিট-পাঁচেক হয়ে গেল, তবু গঙ্গাধর আলো দিয়ে গেল না। ভাবলুম, ওকে ডেকে অন্তত একটা মোমবাতি দিতে বলি। দরজায় গিয়ে "গঙ্গাধর" বলে ডেকেছি, সেইসময় আবছা একটা শব্দ হল ঘরের ভেতর। ভেতরের দিকের দরজাটাও খোলা রয়েছে। ঘুরে দেখি, আবছা একটা মূর্তি কী যেন করছে—খসখস শব্দ হচ্ছে। বাইরের ময়লা জ্যোৎস্না এদিকের দরজা দিয়ে যেটুকু ছটা পাঠাতে পেরেছে, তা অন্ধকারেরই মতো। বললুম, "কে ? কে ওখানে ?"

অমনি হিসহিস করে কে গলার ভেতর বলে উঠল, "চুপ। খতম করে ফেলব।"

কেন যে ছাই টর্চটা বের করে রাখিনি এটাচি থেকে ! তবে আমিও দমবার পাত্র নই। গঙ্গাধর ! গঙ্গাধর ! চোর ! চোর ! বলে যেই চিক্কুর ছেড়েছি, চোর হতচ্ছাড়া আমাকে এক ধাক্কায় কুপোকাত করে বেরিয়ে গেল। কম্বলজড়ানো অবস্থায় মেঝেয় পড়ে আমার দশা হল ফাঁদে পড়া শেয়ালের মতো। কম্বল থেকে বেরিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালুম, তখন গঙ্গাধরের সাড়া এল। সে হেরিকেন নিয়ে দৌড়ে আসছিল।"

গঙ্গাধর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "কী হয়েছে স্যার ? চোর ঢুকেছিল ?"

গম্ভীরভাবে "হুঁ" বলে টেবিলের দিকে তাকালুম। সেই কাগজগুলো নেই। বুঝলুম, আড়াল থেকে চোর নজরে রেখেছিল তাহলে। কিন্তু ওগুলো নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কী ? প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা ? তাছাড়া আর কী হতে পারে ?

গঙ্গাধর গোমড়ামুখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। বলল, "ওদিকে আরেক কাণ্ড। সেজন্যে আলো আনতে দেরি হল। নুটুবাবুর ঘরেও চোর ঢুকেছিল।"

"বলো কী ! কিছু চুরি গেছে নাকি ?"

বইয়ের র‍্যাক খালি করে বইগুলো নিয়ে গেছে।"

"হুঁ, প্রমাণ লোপের চেষ্টা।"

গঙ্গাধর বুঝতে না পেরে বলল, "আজ্ঞে ?"

"কিছু না। তুমি আর একবার কড়া করে চা খাওয়াতে পারো গঙ্গাধর ?"

"আনছি স্যার।" বলে সে চলে গেল।

এবার চোর পালিয়ে বুদ্ধি বেড়েছে আমার। টর্চ আর খুদে ·২২ ক্যালিবারের রিভলভারটা বের করে ফেললুম। কতক্ষণ পরে গঙ্গাধর চা দিয়ে গেল। বলে গেল, "বড়বাবুর শরীর খারাপ করছে। উনি শুয়ে রয়েছেন। বললেন, ওনারা যেন কিছু না মনে করেন।"...

ঘণ্টা-দুই পরে কর্নেল ফিরে এলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "গঙ্গাধরের মুখে সব শুনলুম। আশা করি, বহাল তবিয়তে আছ ডার্লিং !"

"আছি। কিন্তু চোর সেই কাগজগুলো নিয়ে পালিয়েছে। ওদিকে পরিতোষবাবুর ঘর থেকে..."

হাত তুলে গোয়েন্দামশাই বললেন, "শুনলুম। তাতে কী ?" বলে বসলেন এবং

আস্তেসুস্থে চুরুট ধরালেন।

জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় গিয়েছিলেন?"

কর্নেল হেলান দিয়ে বসে বললেন, "আমার বাহাত্তুরে ধরতে যে বেশি বাকি নেই, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে টের পেয়ে যাই। এ বাড়ির সবচেয়ে পুরনো লোক গোবিন্দ দাস। না ডার্লিং, পদাবলী রচয়িতা সেই কবি নন, ইনি মালী। আমার দোসর বলতে পারো। কারণ ক্যাকটাস চেনে। অর্কিড চেনে। এ বাড়ির সব পুরনো গাছের গুঁড়ির ওপর এবং বিভিন্ন ডালে আশ্চর্য সুন্দর এক জাতের অর্কিড আছে। গোড়ার দিকটা লাল, ডগা নীল। এই শীতে তারা ফুল ফোটায়। সাদা থোকা-থোকা ফুল। গোবিন্দ বলল, রাম শন্না কোন মুলুক থেকে এনেছিলেন। পাঁচ পুরুষ ধরে তারা এ-গাছ সে-গাছে জন্মাচ্ছে। মরছে, আবার জন্মাচ্ছে।"

"সেই অর্কিডের গল্প শুনছিলেন গোবিন্দের কাছে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গোবিন্দ এ-বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় সেকেলে আসবাবের মতো। দয়া করে তাকে এখনও আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়নি। তার খুরপিতে মরচে ধরে ভেঙে গেলে তাকে আর নতুন খুরপি এনে দেওয়া হয় না। বড়বাবু তো থেকেও নেই। ম্যানেজারবাবুর যত ঝোঁক চাষবাসে। এমনকী, ওই স্কয়াটে ফুলফলের বাগানে নাকি আলু ফলাবেন বলে শাসিয়েছেন।"

"ম্যানেজার কে?"

"নুটুবাবু—মানে, পরিতোষ।" কর্নেল চোখ বুজে চুরুটে মৃদু টান দিয়ে বললেন, "বেচারা গোবিন্দের ছোট্ট শাবলটা আজ সকাল থেকে উধাও।গোরুছাগলের অত্যাচারে অস্থির। সে একটা বেড়া দেবে ভাবছিল। কিন্তু গর্ত খোঁড়ার শাবলটাও কে চুরি করে নিয়ে যায়। কখন চুরি গিয়েছিল সে জানে না। গতকাল বিকেলেও দেখেছিল।"

"কর্নেল! আপনি কি..."

প্রাজ্ঞ গোয়েন্দা বললেন, "আনন্দের কথা, শাবলের জন্য বড়বাবুর কাছে নালিশের আগেই সেটা সে যথাস্থানে দেখতে পেয়ে খুব অবাক হয়েছে। হ্যাঁ ডার্লিং, ওটা আর ফিরে না এলে গোবিন্দ বড়বাবুকে নালিশ করত। শাবলটা হঠাৎ ওভাবে নিপাত্তা হওয়া নিয়ে জল্পনাকল্পনা হত—বিশেষ করে উমাশংকরের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে।"

কর্নেল ফুঁ দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া সরিয়ে ফের বললেন, "কিন্তু শাবলটা যথাস্থানে ফিরে পেয়ে গোবিন্দ খুশি। তার আর নালিশ জানাবার কারণ থাকে না। হ্যাঁ—পরিতোষ তাই শাবলটা গঙ্গায় ফেলে দেয়নি। জানত, গোবিন্দ ও-নিয়ে মাথা ঘামানোর মানুষ নয়। বরং আর ফিরে না পেলেই মাথা ঘামাত। অন্যদের বলত।"

"শাবলটা দেখলেন?"

মাথা দুলিয়ে কর্নেল বললেন, "নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে শাবলটার কথা আমাকে বলল গোবিন্দ। নইলে ওটা তার কাছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়—অন্তত হারানিধি ফিরে পাওয়ার পর। এখন কথা হচ্ছে, লোহার শাবল দিয়ে মাথার পেছনে আঘাত করলে শাবলে রক্ত লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। রক্ত ছিটকে বেরোতে যত কম হোক, একটু সময় লাগে। ভোঁতা জিনিস দিয়ে চুলের উপর আঘাত। ধরো, রক্ত ছিটকে বেরোতে অন্তত তিন-চার সেকেণ্ড দেরি হবে। তার মধ্যে জিনিসটা সরে এসেছে। কাজেই রক্ত নাও লাগতে পারে। কিংবা যদি লাগে, অনেকসময় খালি চোখে তা দেখা নাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে ফরেনসিক পরীক্ষা ছাড়া কিছু করার নেই। গোবিন্দের শাবলের ওপর এই জোরালো টর্চের আলো ফেলে আতশ কাঁচ দিয়ে

দেখলুম, রক্তের সূক্ষ্ম ছিটে লেগে রয়েছে।"

বলে কর্নেল তাঁর ওভারকোটের ভেতর থেকে কাগজে মোড়া ফুটদেড়েক লম্বা একটা জিনিস বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর বের করলেন একটা বই। চামড়ায় বাঁধানো হলেও সেটার অবস্থা জরাজীর্ণ। অবাক হয়ে বললুম, "ওটা কী ? কোথায় পেলেন ওটা ?"

"তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নে বোঝা যাচ্ছে, তুমি এটা কী বই বুঝতে পেরেছ। ডার্লিং, এই সেই হারানো বই— রামশংকর শর্মার আত্মচরিত।"

"কোথায় পেলেন আগে বলুন ?"

কর্নেল নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বললেন, "গোবিন্দ অর্কিড চেনে। রাম শর্মার আনা অর্কিডের বংশধরদের ওপর তার খুব লক্ষ্য। ফুল ফুটলে তো কথাই নেই, সে আনন্দে নেচে ওঠে। অর্কিডের কথায় খুশি হয়ে বলল, কোণের শিরীষ গাছটার গুঁড়ির ওপর যে অর্কিডগুলো আছে, ওবেলা তাতে ফুল ফুটেছে। দেখবেন নাকি হুজুর ? আমি কেন, সাহেবি-পোশাকপরা সবাই ওর কাছে হুজুর। তো আমার টর্চ খুব জোরালো। ফুল দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল, অর্কিডের ঝালরের ভেতর কী যেন রয়েছে। পাখির বাসা ? গোবিন্দকে বললুম, মই আছে কি ? গোবিন্দ বলল, আনছি হুজুর।"

বাধা দিয়ে বললুম, "অর্কিডের ভেতর বইটা লুকনো ছিল তাহলে ?"

ধুরন্ধর বৃদ্ধ কোনো জবাব দিলেন না। বইটা টেনে নিলুম হাত থেকে। চোখ বুজে চুরুটে টান দিয়ে বললেন, "আগে পরিশিষ্টটা পড়ো, শুনি।"

পড়তে শুরু করলুম। জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। সবটা পড়া যায় না।

"...ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের প্রতি উপদেশ দান নিমিত্ত কহি যে, সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করিবেক। বিশেষত কহি যে যীশুখ্রীষ্টও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া অস্মদ্দেশে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার শোণিতে মনুষ্যজাতির পাপ ধৌত হইয়াছে। অপিচ যে ২ জড়বস্তুসমুদয় তাঁহার শোণিতপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহারা জড়ত্বনাশ হেতু ধন্য হইয়াছে। ...উদ্যানে পক্ষীসকল বিচরণ করে। উহাদের পঞ্চ প্রকার পঞ্চরূপের প্রতীক। সেই পঞ্চরূপ হইল পঞ্চবাণ। খ্রীস্টের শোণিতপ্রাপ্ত পঞ্চবাণ... উদ্যানের শোভাস্বরূপিণী অপ্সরার রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত কহি যে উহার অনিন্দ্যসুন্দর আননে আত্মবলিদানের স্পর্শগুণ বিধায় উহা ধন্য। বহু প্রযত্নে উহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।..."

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে পরিশিষ্ট পড়তে শুরু করলেন। তারপর বললেন, "জয়ন্ত, সম্ভবত এখানেই রাম শর্মা কী যেন আভাস দিয়েছেন। ...অপ্সরামূর্তি— মানে নিশ্চয় ফোয়ারার মাথায় ওই মূর্তিটা। পাঁচকোনা ফোয়ারা। ...রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দিচ্ছেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের। ...উহার অনিন্দ্যসুন্দর আননে আত্মবলিদানের স্পর্শগুণ...জয়ন্ত ! একথায় কি যীশুর ক্রুশে আত্মবলিদান বোঝাচ্ছে না ? ...কিন্তু কথাটা লক্ষ করো। আ—ন—নে। তার মানে মুখে। মুখে মানে মাথার ভেতর... !"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিতভাবে। আমারও মাথার ভেতর একটা সাড়া জাগল। বললাম, "কিন্তু ফোয়ারার ওই অপ্সরার মাথাই তো নেই। কবে ঝড়ের সময় গুঁড়ো হয়ে গেছে। প্রণবশংকর বলছিলেন না ?"

"কিন্তু তাহলে পেরেকটা নিশ্চয় কেউ পেয়েছিল। দেখেও কিছু টের পায়নি। কর্নেল অস্থির হয়ে বললেন। "একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিস !"

বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তারপর টর্চের আলো দেখলুম। কেউ ভারী গলায় বলল, "কোন্ ঘরে ?"

গঙ্গাধরের কথা শোনা গেল, "ওই যে স্যার, হেরিকেন জ্বলছে।"

কর্নেল দরজায় উঁকি মেরে বললেন, "মিঃ সান্যাল নাকি ? চলে আসুন।"

"হ্যাল্লো ওল্ড ডাভ !" একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে কর্নেলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। আরও চারজন পুলিশ অফিসার তাঁর পেছন-পেছন ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম গত দু ঘণ্টা ধরে গোয়েন্দাপ্রবর শুধু গোবিন্দের সঙ্গে আড্ডা দেননি, এঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন।

কর্নেল বললেন, "মিঃ সান্যাল, আলাপ করিয়ে দিই। আমার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী। আর জয়ন্ত, ইনি পুলিশ সুপার মিঃ অজিতেশ সান্যাল।"

অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর কাজের কথা শুরু হল। থানা অফিসার ইন্দ্রজিৎ ভদ্র বললেন, "পরিতোষকে মাঠে মিঃ ব্যানার্জির ফার্মে পাওয়া গেছে। কর্নেল, আপনার অনুমান কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছে। এইমাত্র ওকে পাকড়াও করে সোজা আসছি। আসামি এতক্ষণ থানার লক-আপে।"

কর্নেল বললেন, "এই নিন মার্ডার উইপন। ফরেনসিকে পাঠাতে হবে। ওতে রক্ত আর খুনির হাতের ছাপ আছে। পাকা সাক্ষী গোবিন্দ মালীও।"

কাগজের মোড়কে ভরা শাবলটা একজন অফিসার সাবধানে নিয়ে গেলেন। এতক্ষণে প্রণবশংকর নেমে এলেন। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, "রাস্কেল খুনিটা ধরা পড়েছে ? ধরা পড়েছে কালসাপটা ?"

মিঃ সান্যাল হাসতে হাসতে বললেন, "কিছুক্ষণ আগে। আপনার ফার্ম হাউসে গিয়ে রাত কাটাবে ভাবছিল। আগে থেকে ওত পেতে ছিল আমাদের লোকজন। ভাববেন না, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন গিয়ে।"

প্রণবশংকর বসলেন। বললেন, "চায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। আপনারা একটু বসুন দয়া করে।"

কর্নেল বললেন, "এই দিকটা আমি এখানে আসার পরও ভাবিনি। বোম্বের রোডরিগেরই লোক এখানে আছে ভেবেছিলুম। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলুম না, বোম্বে থেকে ওর পক্ষে এত দ্রুত এখানে যোগাযোগ— তাছাড়া বইটা চুরির খবর পাওয়া, সবই কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছিল। বিকেলে ভৈরবগড় গিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছে যখন জানতে পারলুম, মিঃ ব্যানার্জি বইটা ছাপার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন, তখনই টের পেলুম মিঃ ব্যানার্জির পেছনে থেকে কেউ তাগিদ দিচ্ছে। বহু ভাবনা চিন্তার পর বইটা এবার তার খুব দরকার হয়েছে। যাই হোক, পরিতোষ মরিয়া হয়ে প্রমাণ লোপের চেষ্টা করছিল লোড-শেডিংয়ের সুযোগে। বইটাও শিরীষ গাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু আমি সেখানে থাকায় পারেনি। ভেবেছিল, পরে একসময় এসে নিয়ে যাবে। এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করি মিঃ ব্যানার্জিকে।"

প্রণবশংকর বললেন, "বলুন কর্নেল।"

"ফোয়ারার অপ্সরার মাথা ১৯৪২ সালের ঝড়ে ভেঙে গিয়েছিল। তখন আপনার বয়স কত ?"

"তা চব্বিশ-পঁচিশ হবে।"

"তাহলে তো আপনার মনে থাকা উচিত। অপ্সরার মাথা ভেঙে যাওয়ার পর কোনো পেরেক জাতীয় কিছু দেখেছিলেন ওর ভেতর ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ। গলার ভেতর লোহার শূল মতো বসানো ছিল—মুণ্ডুটা জোড়া দেওয়ার জন্য।"

কর্নেল শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "না মিঃ ব্যানার্জি, ওটাই সেই পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেক।"

"বলেন কী!" প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন। "তাই বুঝি ওটার গায়ে খুদে হরফে কী সব লেখা ছিল যেন।"

"সেটা তারপর কী হল মনে আছে?"

গঙ্গাধর দরজার কাছ থেকে বলল, "কেন বড়বাবু, সেটা গোবিন্দের বউ উপড়ে এনেছিল না? ছাগল বাঁধার খুঁটি করেছিল। গোঁজের মতো জিনিসটা। গায়ে নকশাকাটা ছিল।"

কর্নেল বললেন, "তাহলে সেটা গোবিন্দের ঘরে থাকা উচিত।"

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে বলল, "গোঁজটা ভারী অপয়া ছিল স্যার। গোবিন্দের বউ যে-ছাগল ওতে বাঁধত, হয় তাকে শেয়ালে নিয়ে যেত, নয় তো রোগে ভুগে মারা পড়ত। শেষে বউটাও মরে গেল। তখন গোবিন্দ একদিন ওটা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। তারপর আর কোনোরকম ক্ষেতি হয়নি স্যার!"

কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, "গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল?"

এতক্ষণে দেখলুম দরজার কাছে একটা ভীষণ বুড়োমানুষ তুলোর কম্বল জড়িয়ে বসে রয়েছে। সে খকখক করে কাসল প্রথমে। তারপর বলল, "হুজুর, ওই নকশাকাটা মন্তর লেখা গোঁজই এ বাড়ির সব্বনাশ করেছে। বড়বাবুর ছেলেপুলে নেই। একটা ভাই ছিল, সেও বেঘোরে খুন হলেন। ইদিকে আমার দশা দেখুন। কোনোরকমে বেঁচে আছি। কোনো সুখশান্তি নেই হুজুর। সেই থেকে কোনো সুখশান্তি নেই। ওই যে কথায় বলে, যত হাসি তত কান্না/ বলে গেছে রাম শন্না! লোহার গোঁজে মন্তর খোদাই করে রেখেছিল কেউ। তাইতে ওনারও ফাঁসিতে পেরান গিয়েছিল।"

ঘরে সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আলো জ্বলে উঠল। প্রণবশংকর বললেন, "গঙ্গু! চা কোথায় রে?"

"আনি বড়বাবু"! বলে গঙ্গাধর চলে গেল।

কর্নেলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, গালে হাত রেখে বসে আছেন চুপচাপ। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। পবিত্র ঐতিহাসিক জিনিসটা উদ্ধার করতে পারলে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে পারতেন তুমুল উত্তেজনায়।...

সকালের ট্রেন ধরব বলে আমরা তৈরি হয়েছিলুম। কর্নেল বললেন, "এসো জয়ন্ত! একবার ফোয়ারার বিদেশিনী অপ্সরাকে বিদায় জানিয়ে আসি।"

ফোয়ারার কাছে গিয়ে বললেন, "আমায় সত্যি বাহাত্তুরে ধরেছে ডার্লিং। নইলে কাল দুপুরে এই পাঁচকোনা ফোয়ারা দেখেই অনুমান করা উচিত ছিল, এখানেই রহস্যের চাবি লুকিয়ে রয়েছে। ওটা দেখামাত্র খ্রীস্টীয় পবিত্র নক্ষত্রের কথা মাথায় এসেছিল। অথচ পেরেকটার সঙ্গে এর স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকা উচিত। **SATOR, AREPO, TENET, OPERA ROTAS**! এক মিনিট!"

বলে কর্নেল ফোয়ারার ভেতর নেমে ফাটলধরা চুনকংক্রিটের স্তম্ভের একদিকে ঘাস ও আগাছা সরালেন। একটা ছুরি বের করলেন পকেট থেকে। ছুরি দিয়ে ঘষতে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ।

তারপরই মুখ তেতো করে সরে এলেন। দেখি, স্তম্ভের গায়ে একটা কাকের টেরাকোটা মূর্তি ফুটে বেরিয়েছে। তাহলে অন্যদিকে কোকিল, কাকাতুয়া, কাঠঠোকরা আর কাদাখোঁচাও নিশ্চয় আছে।

কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু আর ঘুরেও দাঁড়াতে রাজি নন। বললেন, "ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। চলে এসো জয়ন্ত।"

বুঝলুম, ওই কাকটাই গণ্ডগোল বাধিয়েছে। কাক ওঁর দুচোখের বিষ।...

পালকির আরোহী সাহেব-পর্যটক (প্রাচীন চিত্র : শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্তের সৌজন্যে)

পালকি থেকে মেট্রো

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

ক্লিভল্যাণ্ড নামে এক ইংরেজ ১৭৭৭ সালে কলকাতায় এসে পালকিতে চড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পালকিতে চড়ার পরে ক্লিভল্যাণ্ড শুনতে পেলেন, বাহকরা কাতরাচ্ছে। উনি ভাবলেন তাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত। পালকি থামিয়ে নেমে দাঁড়ালেন তিনি। দেখলেন, বাহকরা দিব্যি খোশ-মেজাজে আছে। আবার চড়লেন। ফের সেই কাতরানি। শেষে পালকি থেকে নেমে হেঁটেই রওনা দিলেন তিনি। আসলে পালকি বইবার সময় বাহকরা সুর করে পথ-নির্দেশ দেয়, সাহেব সেটাকেই ভেবেছিলেন কাতরানি। সে-আমলে পালকির সারাদিনের (১৪ ঘণ্টা) ভাড়া ছিল মাত্র চার আনা, আর বেহারার মজুরি ছিল চার আনা। বেহারাদের বেশির ভাগই ছিলেন ওড়িয়া। পরবর্তী কালে নানা ধরনের কাজ-করা পালকি তৈরি হত কলকাতায়। সলভিন্স নামে এক শিল্পী একটি পালকি বানাবার জন্য দশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। এই জাতীয় পালকিকে বলা হত 'ময়না' পালকি।

তারপর এল ঘোড়ার গাড়ির যুগ। অবশ্য কলকাতায় তখন হাতিও চলত

আজও অদ্বিতীয়
কুণ্ডুটেক্সটাইলের
গেঞ্জী • জাঙ্গিয়া
সার্ট
REGD
T.MARK
Manufactured by KUNDU TEXTILES CALCUTTA

স্কুলের ছেলেমেয়েদের
নিত্যসঙ্গী
Kanak
এলুমিনিয়াম
স্কুল বক্স ও
লাঞ্চ বক্স
প্রস্তুতকারকঃ
পি এল মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
কলিকাতা–৭০০ ০০৫

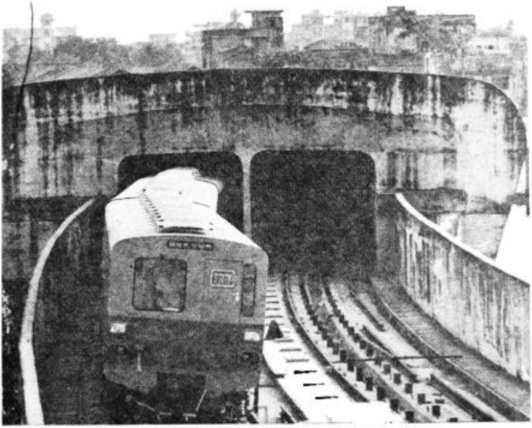

কলকাতায় ভূগর্ভ-রেলের কাজ চলছে ; শেষ হলে নিশ্চয় ট্রাম-বাসের ভিড় কমবে

কিছু-কিছু। সে হাতি দেখে ঘোড়ারা খেপে গিয়ে গাড়ি উলটে দিয়ে দৌড় মারত অনেক সময়। কত রকমের গাড়ি—জুড়ি, চৌঘুড়ি, আটঘুড়ি, ল্যাণ্ডো, ল্যাণ্ডোলেট, ফিটন, বগি, ব্রাউনবেরি, ব্রুহাম, দশফুকার, সারাব্যাংক, পাল্‌কি, ডাকগাড়ি ও এক্কা। বাবুরা জুড়ি, ব্রুহামে চড়ে ইডেনে বিলিতি ব্যাণ্ড শুনতে এবং গঙ্গার হাওয়া খেতে যেতেন। সাধারণ লোক চড়ত কেরাঞ্চি গাড়ি। ঘোড়া ও গাড়ি দুই-ই ভাড়া পাওয়া যেত। দৈনিক ৫ টাকা থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত ছিল ভাড়ার হার।

কলকাতায় ১৯০১ সালে গোরুর গাড়ি চাপা পড়ে লোক মারা গেছে—এ-দৃষ্টান্তও আছে। বাইসাইকেল এল এই সালেই। কলকাতায় এল ঘোড়ায়-টানা ট্রামের যুগ। সেও গেল ১৯০২-এ। এল ইলেকট্রিক ট্রাম। তারপর দু-এক বছরের মধ্যেই মোটরগাড়ি। পাবলিক বাস, ট্যাক্সি চালু হল ১৯২০ সালে। আর এখন তো ওইসব যানবাহনের ভিড়ে মানুষের পথ চলার জায়গাই পাওয়া যায় না। তবুও লোকের এ-শহরে যাতায়াতের সমস্যা ঘুচছে কই!

এবার আসছে মেট্রো রেল। বেলগাছিয়া থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত মাটির নীচে সুড়ঙ্গ করে ট্রেন চালানো হবে। দেখা যাক কতটা সুরাহা হয় এতে।

এ-যুগে বসে কি ভাবা যায় যে, এই কলকাতায় পাল্‌কি চলত এককালে। অথবা নৌকো? সোজা এখানকার ক্রিক রো ধরে খাল বেয়ে চলে যাওয়া যেত দক্ষিণ-বঙ্গ পর্যন্ত!

রাবণ রাজার টাক ছিল
পরচুলোতে ঢাকছিল ॥
জ্যাবোরাণ্ডি মেখে মাথায়
চুল এলিয়ে হাসছিল ॥
Jaborandi
HAIR OIL
জ্যাবোরাণ্ডি
কেশ তৈল
ডাঃ এস, ডি, দেবনাথ
হোমিও ল্যাবোরেটরী
হাওড়া সাবওয়ে,
হাওড়া—৭১১১০১
adking

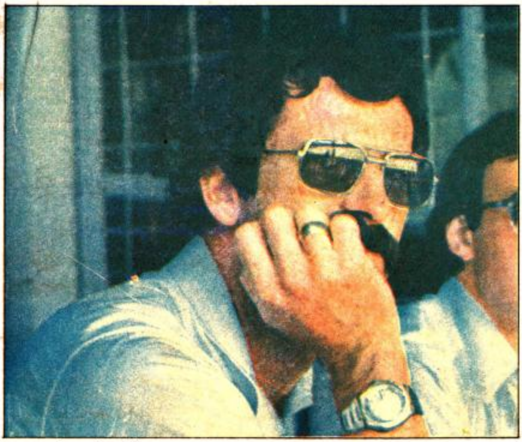

এক মেজাজি ডেনিস লিলি

মেজাজ গরম

মণি শর্মা

কোনো প্রতিযোগিতায় জিতুন আর না জিতুন, জন ম্যাকেনরো কিন্তু খবরের কাগজের হেডলাইন হয়ে যাচ্ছেন প্রায়ই। আজ লাইন কল নিয়ে রেফারিকে গালিগালাজ, কাল দর্শকদের উদ্দেশে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, পরদিন প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ করে কটু কথাবার্তা, দুদিন পরে মেজাজ গরম করে র‍্যাকেট ছুঁড়ে ফেলা ইত্যাদি। এই সব কারণে বহু-আলোচিত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন ম্যাকেনরো। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক কিছুকাল আগে মন্তব্য করেছেন, "ভারী মজার ব্যাপার এই যে, ম্যাকেনরোর টেনিস নিয়ে লোকে যত না আলোচনা করে, তার চেয়ে ঢের বেশি আলোচনা করে তাঁর কুকীর্তি নিয়ে।"

ম্যাকেনরোর এই ব্যবহারের জন্য টেনিস-জগতের সকলেই ব্যথিত। ব্যাপারটা অবশ্য নতুন নয়। অ্যাশ-নাসতাসে খেলে নাম করেছিলেন, এটা ঠিক। সঙ্গে এটাও ঠিক যে, অ-খেলোয়াড়োচিত ব্যবহারের জন্যেও তাঁরা বেশ পরিচিত ছিলেন। বিল টিলডেন, জারোস্লাভ ড্রবনিও কোর্টে দাঁড়িয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করতেন। তার আগেও এমন সব কাণ্ড-কারখানা ঘটেছে।

আর-এক জন ম্যাকেনরো

ক্রিকেট হচ্ছে রাজার খেলা। সৌজন্য, শিষ্টতা ও ভদ্রতা যার প্রতি ইঙ্গিতে ছড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু সেখানেও এখন উলটো-পালটা সব ব্যাপার ঘটছে। কিছুদিন আগে লিলি দর্শকদের সম্পর্কে চেঁচিয়ে খারাপ কথা বলেছিলেন বলে তাঁকে জরিমানা করা হয়েছে। অবশ্য এটা লিলির কাছে নতুন কিছু নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে ডোনস লিলির কাছে এসব জলভাত হয়ে গেছে। প্রায়শই মেজাজ গরম করে অপকর্ম করার অপরাধে অস্ট্রেলিয়ার এই প্রতিভাশালী বোলারটিকে জরিমানা গুনতে হয়। বহু ক্রিকেটার এই ধরনের অপরাধ করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, খেলোয়াড়রা কেন অমন করেন? কেউ-কেউ বলেন, প্রতিপক্ষের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে খানিকটা কাবু করে ফেলাই এসবের উদ্দেশ্য। এই ধরনের চিৎকার-চেঁচামেচি, অঙ্গভঙ্গি দেখলে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা ঘাবড়ে যেতে পারেন। মনঃসংযোগ নষ্ট হতে পারে। তখন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খেলায় জয়লাভ করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এই জাতীয় খেলোয়াড়রা এই ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই নাকি নানারকম আবোল-তাবোল আচার-ব্যবহার করে থাকেন।

কারও-কারও মতে, এই জাতীয় খেলোয়াড়দের ধৈর্য বা সহনশীলতা কম। ফলে, সামান্য অসঙ্গতি দেখা দিলেই এঁরা ভীষণ চটে যান। নিজেদের মেজাজ ঠিক রাখার ক্ষমতা কম বলে এঁরা ভাল ব্যবহার করতে পারেন না।

এই ধরনের অন্যায় যাঁরা করেন তাঁদের কি কখনও পেলে, ওরেল কিংবা বর্গের কথা মনে পড়ে না? নাকি তাঁরা সব দেখেও অন্ধ হয়ে থাকেন!

‘ফলো-উইন’

সম্রাট রায়

টেস্ট ক্রিকেটে ফলো-অন খাওয়া তেমন কোনো বড় ঘটনা নয়। কিন্তু ফলো-অনের ধাক্কা সামলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটাই জিতে নেওয়া প্রায় অলৌকিক ব্যাপার। টেস্ট ক্রিকেটের শতাধিক বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন নজির অবশ্য দুটির বেশি চোখে পড়ে না। ফলো-অনের পরে ম্যাচ জয়ের দুর্ধর্ষ দৃষ্টান্তটি প্রথম তৈরি হয় ১৮৯৪-৯৫ সালে সিডনিতে। সর্বশেষ নজিরটি গড়ে ওঠে ১৯৮১ সালে লিডসে। আশ্চর্য, দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এবং দুবারই অলৌকিক কাণ্ড ঘটায় ইংল্যাণ্ড।

ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সেইটাই ছিল প্রথম পাঁচ টেস্টের সিরিজ। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জে ব্ল্যাকহাম টস জিতে প্যাভেলিয়ানে ফিরে এসে ব্যাটসম্যানদের উদ্দেশে বললেন, “পারফেক্ট ব্যাটিং ট্রাক। অন্তত চারশোতে না পৌঁছবার কোনো কারণ দেখছি না।” ব্যাটসম্যানরা ক্যাপ্টেনকে নিরাশ তো করেনইনি, উপরন্তু চাহিদার থেকেও বেশি রান জমা দিলেন অস্ট্রেলিয়ার ভাণ্ডারে। জর্জ গিফেন নিজস্ব টেস্ট জীবনের সর্বাধিক স্কোর (১৬১) করলেন। এবং ডাবল সেঞ্চুরির মাধ্যমে (২০১) টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করলেন সিড গ্রেগ্‌রি। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস শেষ করল ৫৮৬ রানে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ফাস্ট বোলার টম রির্চাডসন পেলেন ১৮১ রানে ৫ উইকেট।

বিরাট রানের জবাবে ইংল্যাণ্ডের ইনিংস টলমল করতে করতে কোনোক্রমে ৩২৫ রানে এসে পৌঁছল। দলের সর্বাধিক রান (৭৫) এল অ্যালান ওয়ার্ডের ব্যাট থেকে। জর্জ গিফেন ৭৫ রানে ৪ উইকেট নিলেন।

২৬১ রানে পিছিয়ে-থাকা ইংল্যাণ্ড স্বপ্নেও ভাবেনি কী অত্যাশ্চর্য নাটক জমা রয়েছে পরের কটা দিনে। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসেও অ্যালান ওয়ার্ড প্রথম ইনিংসের মতোই একটি পরিচ্ছন্ন ইনিংস (১১৭) খেললেন। ওয়ার্ডের পাশে প্রায় সকলেই দায়িত্ব-সচেতন হয়ে ওঠায় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়াল ৪৩৭। জর্জ গিফেন এবারও পেলেন চারটি উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া যখন দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামল আকাশে তখন জয়ের শঙ্খচিল। মাত্র ১৭৬ রানেরচ্যালেঞ্জসামনে রেখে অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেট হারিয়ে প্রায় হাসতে হাসতে পৌঁছে গেল ১৩০ রানে। তারপরই ঘটল প্রায় অলৌকিক কাণ্ডটি।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে যেন ধস্ নামল। রবার্ট পিল এবং জন ব্রিগসের সামনে মাত্র ছত্রিশ রানে বাকি সাত জন অস্ট্রেলিয় ব্যাটসম্যান অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। ১৬৬ রানে মুড়িয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। পিল ৬৭ রানে ৬টি এবং ব্রিগস ২৫ রানে ৩টি উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ডকে উপহার দিলেন এক অভাবনীয় জয়। প্রথম ইনিংসে প্রায় ছশো রান করেও অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ হারল! অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ওই ম্যাচের একমাত্র সান্ত্বনা হিসেবে রইল জর্জ গিফেনের ব্যক্তিগত রেকর্ডটি। একই ম্যাচে সবসমেত ২০২ রান এবং মোট ৮টি উইকেট নেবার কৃতিত্বটি সিরিজের সব-সেরা নজির হয়ে রইল।

১৯৮১-র লিডসের সাম্প্রতিক ঘটনাটি অবশ্য অনেকেরই মনে আছে। বথামের দানবীয় ব্যাটিং এবং উইলিসের দুর্ধর্ষ বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ড অভাবিত জয় পায়।

টেস্ট ক্রিকেটে ফলো-অনের পরে জয়ের এই অদ্ভুত ঘটনা দুটিকে ‘ফলো-উইন’ নাম দিলে কেমন হয়?

BAPI
Bapi
REGD.
বাপি
বাপি স্টার
গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া
মোজা • শার্ট
নকল হইতে সাবধান
হিন্দুস্থান টেক্সটাইল
কলিকাতা-৭০০ ০০৫

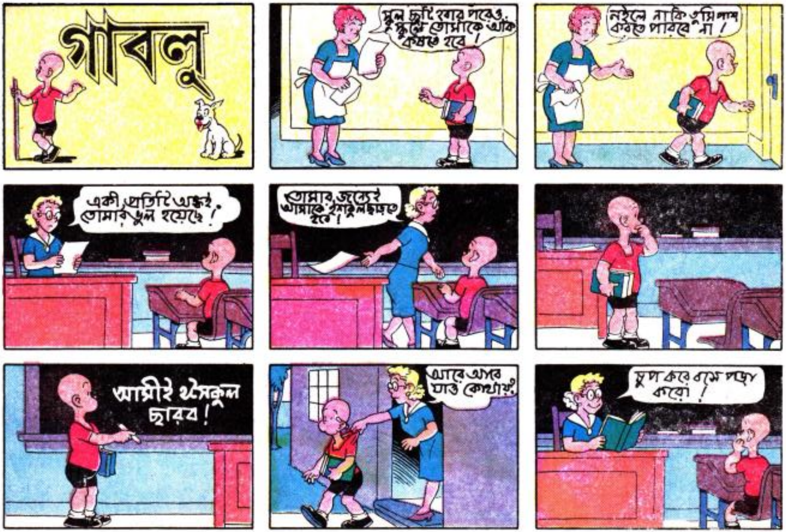
গাবলু
স্কুল ছুটি হবার পরেও, স্কুলে তোমাকে থাকতে হবে!
নইলে নাকি তুমি পাশ করতে পারবে না!
একী প্রতিটি অঙ্কেই তোমার ভুল হয়েছে!
তোমার জন্যেই আমাকে ইশকুলে থাকতে হবে!
আমীই এইসকুল ছারব!
আরে আরে যাও কোথায়?
চুপ করে বসে পড়ো!

'আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
সূর্য্যি গেল পাটে।
খুকু গেল জল আনতে
পদ্ম দিঘির ঘাটে ॥
পদ্ম দিঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল।
হাঁটুর উপর দুলছে খুকুর
গোছাভরা চুল ॥'
Oasis
DOUBLE ACTION HAIR FERTILIZER
ঘন কালো সুন্দর
চুলের জন্য
ওয়েসিস ®
ডাবল্ অ্যাক্শান্
হেয়ার ফার্টিলাইজার
প্রস্তুত কারক :
HRI
হার্বল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
কলিকাতা-৭০০ ০০৫
সব বড় দোকানে পাওয়া যায়।

আরো সূক্ষ্ম ভাগ

বাচস্পতি

হিগিনকাকুর জিভ যে শুধু কালো কফি খেয়ে শান্ত হল তা নয়, সেই সঙ্গে রান্নাঘর থেকে আসা খান-পনেরো গরম-গরম পেঁয়াজিও বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেল। তারপরে একটা মস্তবড় আরামের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বড়সড় বুকখানা থেকে। চোখ দুটিও বুজে ফেললেন সুখে। সেই অবস্থাতেই বললেন, "কী হচ্ছে ?"

ভন্টু বলল, "ব্যঞ্জন—"

"আহা ব্যঞ্জন তো বুঝলাম, কিন্তু কী ব্যঞ্জন ?"

"ঐ তুমি কী-সব বলছিলে, 'বাধিত', 'বিস্তৃত' কী যেন সব ?"

হিগিনকাকু মিটিমিটি হেসে বললেন, "আরে আমি অন্য ব্যঞ্জনের কথা বলছি না, অন্নব্যঞ্জনের কথা বলছি। কী রান্না হচ্ছে ?"

ভন্টুর বাবা হেসে ফেলে বললেন, "শিবরাম চক্রবর্তী তোর ওপর আবার ভর করলেন কেন ? যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে, তোর ভাবনার কিচ্ছু নেই। তুই এখন এই ব্যঞ্জনের কথা বল্—"

"হ্যাঁ, ধ্বনির ব্যঞ্জনের কথা—" ভন্টু জোর দিয়ে বলল।

হিগিনকাকু আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অভিমানী চোখে বললেন, "নাঃ, বড্ড বেরসিক তোমরা। যাই হোক, ধরো—প্রথমে দুটো ভাগ : 'বাধিত' আর 'বিস্তৃত' ব্যঞ্জন—ইংরেজিতে obstruant আর continuant। 'বাধিত' হল ক্ খ্ গ্ ঘ্ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ত্ থ্ দ্ ধ্ প্ ফ্ ব্ ভ্—এই ষোলোটা। 'বিস্তৃত' হল ঙ, ন, ম, ল, শ (স), হ—এই ছ-টা। 'স'-কে আমি শ্-এরই একটা বিশেষ রূপ ধরছি।"

"আর ঘর্ষিত ?" ভন্টুর প্রশ্ন শোনা গেল।

"ঘর্ষিত বা affricate হল চ্, ছ্, জ্, ঝ্।"

"ব্যস্,এই ?"

"না রে দাদা। এবার বাধিত আর ঘর্ষিতগুলোর মধ্যে আবার উচ্চারণের ধরন অনুযায়ী সাজাও—'অল্পপ্রাণ' : ক্ গ্ চ্, জ্, ট্, ড্, ত্, দ্, প্, ব্ ; 'মহাপ্রাণ, অর্থাৎ যেগুলো উচ্চারণে মুখের রাস্তা একটু শক্ত হয়ে আটকে যায় বলে বাতাস একটু জোরে ধাক্কা দিয়ে বেরোয়—খ্ ঘ্ ছ্ ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্, এমন-কী ঢ় ; 'ঘোষবৎ', অর্থাৎ যেগুলোর উচ্চারণে গলার স্বরতন্ত্রী দুটো একটু রিন-রিন আওয়াজ করে কাঁপে—গ্, ঘ্, জ্, ঝ্, ড্, ঢ্, দ্, ধ্, ব্, ভ্। মনে রাখবে স্বরধ্বনি আর নাসিক্যধ্বনি হল 'সঘোষ' অর্থাৎ সেগুলোর উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর আওয়াজটা একটানা হয়। কিন্তু 'ঘোষবৎ' ব্যঞ্জনে ঐ আওয়াজটা আংশিক। 'অঘোষ' ব্যঞ্জনে ঐ আওয়াজ হয়ই না—যেমন ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্, ত্, থ্, প্ ফ্, শ্ (স্)। নাসিক্য ব্যঞ্জন হল ঙ, ন, ম—উচ্চারণে বাতাসটা বেরোয় নাক দিয়ে। 'ল' হল 'পার্শ্বিক' ব্যঞ্জন—বাতাস জিভের পাশ দিয়ে বেরোয় বলে। 'র' হল 'রণিত' (trill), ড়্, ঢ়্, হল 'তাড়িত' (flapped) ; শ (স) আর হ্ হল উষ্মব্যঞ্জন (fricative)—তার মধ্যে শ্ (স্)-কে বলে শিস্ধ্বনি (sibilant)।"

"সব গুলিয়ে ফেলব কাকু !" ভন্টু আর্তনাদ করে উঠল।

"ঠিক আছে, মা ভৈঃ। ছক করে সাজিয়ে দিচ্ছি।"

(ক্রমশ)

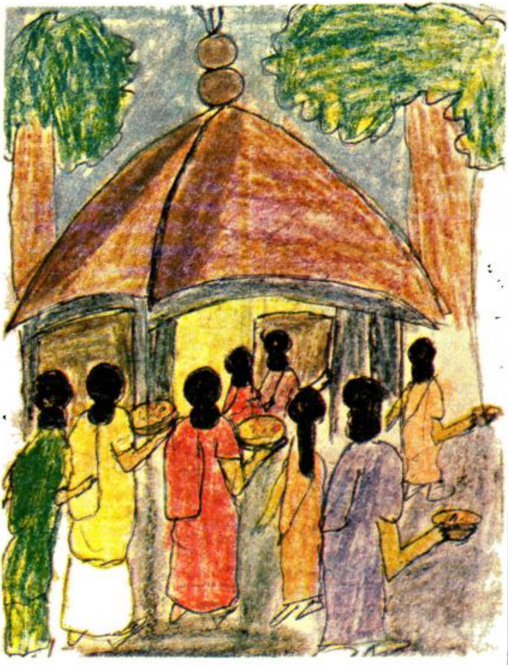

ছবি এঁকেছে **কেকা দত্ত** (বয়স ৮)

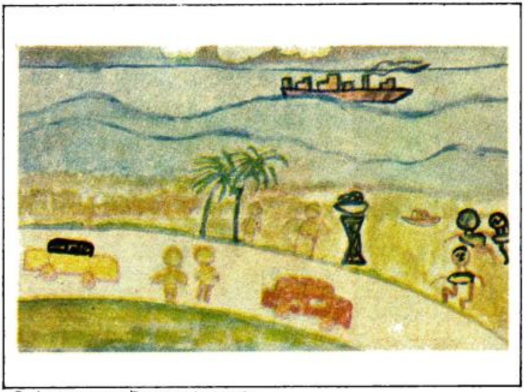

ছবি এঁকেছে পাপ্পু চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৫)

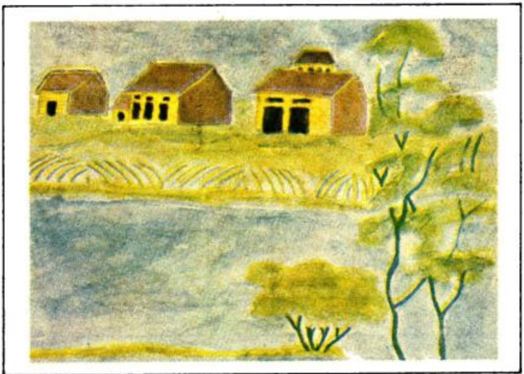

ছবি এঁকেছে ভাস্কর গুহ (বয়স ৯)

পূর্ণেন্দু পত্রীর

আজব মজাদার একটি বই
এবং কলকাতা-সিরিজ

কলকাতা নিয়ে লেখা পূর্ণেন্দু পত্রীর আশ্চর্য তিনটে বইয়ের নাম তো সবাই জানো, সবাই পড়েছো। কিন্তু সেই বইটার কথা জানো কি, যেখানে শেয়ালদের মুখের ভাষায় একটা দারুণ গল্প শুনিয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী? ওফ্, সে এক দুর্ধর্ষ বই।

সেই বইটা হল, 'ম্যাকের বাবা খ্যাঁক।' ম্যাক মানে ম্যাকবেথ। না, শেকসপীয়রের ম্যাকবেথ নয়। এ হল একটা শেয়ালের নাম। ম্যাকের বাবার নাম 'খ্যাঁক' ওরফে হেরম্ব। খুব খানদানী শেয়াল-পরিবার এরা। সিরাজদৌলার কানে কানে এদেরই এক পূর্বপুরুষ বলে উঠেছিল একটা ছড়া, আর তাইতে না সিরাজদৌলা হদিশ পেলেন কলকাতায় ঢোকার রাস্তার।

তা সেই ম্যাক, খ্যাঁক আর এক কলমবাবুকে নিয়েই 'ম্যাকের বাবা খ্যাঁক'। মুচমুচে আর মজাদার ছড়ায় ভর্তি। সেই সঙ্গে পাতা-জোড়া চোখ-ভোলানো ছবি। ভাষা বুঝতে কষ্ট নেই, মানে দেওয়া আছে। ছবি এঁকেছেন দেবাশিস দেব, মলাট পূর্ণেন্দু পত্রী। সব-দিক থেকেই আজব আর মন-ভরানো উপহার 'ম্যাকের বাবা খ্যাঁক'।

পূর্ণেন্দু পত্রীর বই :

ম্যাকের বাবা খ্যাঁক	৭·০০
কলকাতার রাজকাহিনী	৬·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা	৫·০০
কী করে কলকাতা হলো	৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

যাত্রার দল

একটা যাত্রা দেখে এসে আমাদের ইচ্ছে হল আমরাও একটা যাত্রা করব। আলোচনার পর ঠিক করলাম আমাদের প্রথম পালা হবে রামায়ণ। তাই দরকার রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণ, সোনার হরিণ, পঞ্চবটী বন ইত্যাদি।

ঠিক করলাম বাড়ির পাশের আমবাগানটি আমাদের পঞ্চবটী বন হবে। ধীরে ধীরে আমার যাত্রা-পার্টির লোক দাঁড়াল পাঁচ। আমি নাম দিলাম 'নির্ঝরিণী অপেরা'। আমি ছিলাম এই দলের পরিচালিকা। এই দলের কেউ রিহার্সাল দেওয়া পছন্দ করত না।

একদিন আমরা যাত্রাপালা শুরু করলাম। শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরে রাম আমাকে বলল, "তারপর কী বলব বল না?" বনে যাওয়ার সময় হতে সীতা বলল, "আমি বনে যেতে পারব না।" যদি বা তাকে জোর করে পাঠানো হল কিন্তু যখন রাম-রাবণে যুদ্ধ আরম্ভ হল তখন সীতা বলল, "আমিও রামের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

সোনার হরিণ করা হয়েছিল আমার লাল কুকুরটিকে। যখন তার স্টেজে আসার কথা তখন দেখা গেল সে নেই। তার আগেই কোথায় পালিয়ে গেছে। রামকে লক্ষ্মণের দাদা বলার কথা। কিন্তু সে বলল, "রাম আমার থেকে নিচু ক্লাসে পড়ে। ওকে আমি দাদা বলতে পারব না।"

রাবণকে যখন রাম মারতে গেল তখন সে বলল, "আমি মরতে পারব না।" এই বলে সে বাড়ি চলে গেল। আমাদের অভিনয় যারা দেখল তারা এই পার্টির নাম দিল 'ঝরঝরে অপেরা'।

ঈশিতা অধিকারী (বয়স ১১)

বেড়ালের ঝগড়া

আমাদের বাড়িতে দুটো বেড়াল ছিল। একটা বেড়াল ছিল কালো-সাদা, আর একটা বেড়াল ছিল বাদামি-সাদা। কালো-সাদা বেড়ালটা ছিল ভীষণ রোগা এবং বাদামি-সাদা বেড়ালটা ছিল ভীষণ মোটা।

রোজ দুই বেড়ালে খুব ঝগড়া হত। রোজ দুই বেড়ালে কিছু না কিছু একটা কাণ্ড বাধাবেই। একদিন রাত্রিবেলা আমাদের বাড়িতে দুই বেড়ালে ঝগড়া করতে গিয়ে একটা কাচের গেলাস এবং একটা কাচের শিশি ভেঙে দিয়েছিল।

কালো-সাদা বেড়ালটা যেহেতু রোগা, সেইজন্য বাদামি-সাদা বেড়ালটার সঙ্গে ঝগড়াতে এঁটে উঠতে পারত না।

একদিন রাত্রিবেলা দুই বেড়ালে একজনের বাড়ির টালির উপর ঝগড়া করছিল। ঝগড়া করতে করতে কালো-সাদা বেড়ালটাকে বাদামি-সাদা বেড়ালটা নীচে ফেলে দিয়েছিল। আর কালো-সাদা বেড়ালটা অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল। তাই দেখে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল।

মেধা জানা (বয়স ১২)

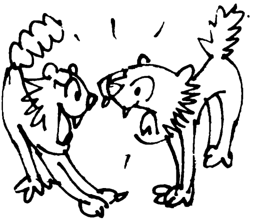

বাঘা

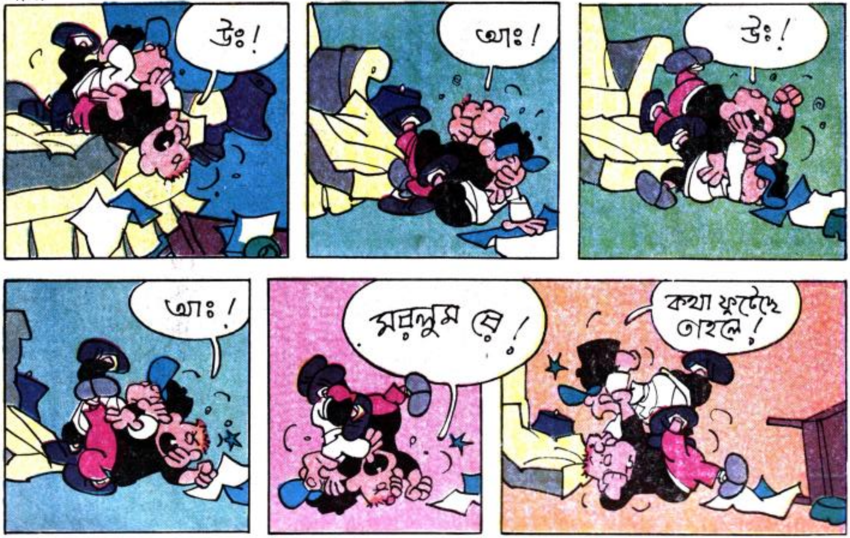

নতুন!

MAGGI®

2-মিনিট নুডলস্‌

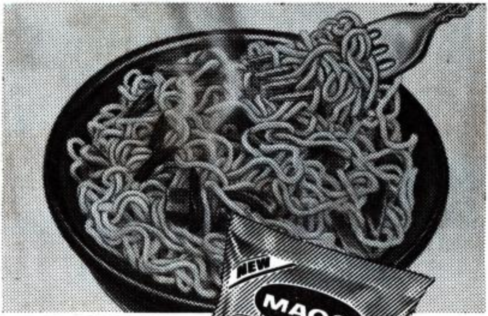

সবচেয়ে সুস্বাদু জলখাবার!

উচ্চমানের গম থেকে তৈরী ময়দা এবং উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ দিয়ে তৈরী ম্যাগি 2-মিনিট নুডল্‌স্‌ স্বয়ংক্রিয় কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সেদ্ধ করে এবং ভেজে তৈরী করা হয়।

প্রত্যেকটি টেস্টমেকারই এক ভাল ও বিশেষ মশলার সংমিশ্রণ।

মশলা, চিকেন এবং ক্যাপসিকা—এই তিনটি চমৎকার গন্ধ থেকে যেটা খুশি বেছে নিন।

ফুটন্ত জলে ম্যাগি 2-মিনিট নুডল্‌স্‌ আপনার পছন্দসই টেস্টমেকারের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। তারপর 2 মিনিট ফোটান। ব্যস্‌ এবার পরিবেশন করুন এক গরম গরম সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যকর জলখাবার।

কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরেই পাওয়া যাচ্ছে।

CLARION/61BEN

কম সময়ে রান্না! খেতেও চমৎকার!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি
প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ),
লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ।
রেক্সোনা মেখে স্নান করুন—
এ আপনার ত্বক রাখে কোমল
ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয়
সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন
নেবার স্বাভাবিক উপায়।

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 E